অরণ্যের দিন ফুরালো

শৈল চক্রবর্তী
সুশীল চক্রবর্তী
পি· এইচ· ডি·
বিশ্বভারতী





অরণ্যের দিন ফুরালো

শৈল চক্রবর্তী
সুশীল চক্রবর্তী পি. এইচ. ডি.
বিশ্বভারতী

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা-১

প্রকাশক ॥
শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ॥ ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ॥ অক্টোবর ১৯৮৬

প্রচ্ছদ এবং অলংকরণ ॥ শৈল চক্রবর্তী

মূল্য ॥ ১৬·০০ টাকা

মুদ্রণ ॥
শ্রীকাশীনাথ পাল
প্রিন্টিং সেণ্টার
৪৮/২-এ শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

॥ ভূমিকা ॥

যে কোন বই-এর প্রথমে ভূমিকা লেখার একটি রীতি আছে, আমিও সে রীতি লঙ্ঘন করতে চাই না। কেন না পুস্তক প্রকাশনা ব্যাপারে লেখকের কিছু বক্তব্য থাকা স্বাভাবিক।

পেশাগতভাবে আমি শিল্পী। আমাকে অনেকগুলি বিষয়ে সাহায্য না করলে অরণ্যের মত বিরাট একটি বিষয়বস্তু নিয়ে রচনা সম্ভব হত না। বিশ্বভারতীর কৃষি-অর্থনৈতিক গবেষণা কেন্দ্রের বহুদিনের কর্মী আমার আত্মীয় শ্রীমান সুশীল চক্রবর্তীর সঙ্গে যুগ্ম-সহযোগিতায় এই কাজটি সম্ভব হয়েছে।

আমার ছোটবেলার দিনগুলি কেটেছে পল্লীগ্রামে, বহুদিন আগে যেখানে প্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্য গাছে গাছে মাঠের সবুজে সবুজে ঝরে পড়ত। বনস্পতির তলায় ঘুরে বেড়াতাম আম জাম কুড়োবার জন্যে শুধু নয়, নিছক আনন্দের প্রেরণায়। ঋতুগুলির লীলানর্তন চলত মহাসমারোহে। পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরে এসে সেই যোগ-সূত্র হারিয়ে গেছে। কিন্তু মনের বিশেষ কোনো স্থানে হয়ত বা অবচেতনে অরণ্যপ্রীতির একটা মধুর স্মৃতি যেন অতৃপ্ত হয়ে থেকে গিয়েছিল। তাই পাহাড়-পর্বত অঞ্চলে যখনই গেছি, দেশে বা বিদেশে, বনাঞ্চলের সবুজ মর্মর এসে বেজেছে কানে।

মনে পড়ে বহুদিন আগে পুরীর সমুদ্রতীরে বন্ধুসহ পূর্ব-পশ্চিমে যতদূর সম্ভব বালিয়াড়ীর পথ ভেঙ্গে চলে গেছি। পূর্বদিকে চক্রতীর্থের দূর প্রান্ত জুড়ে একটি সবুজ বনানীর ঘন নিবিড় মূর্তি এক রহস্যের আকর্ষণ সৃষ্টি করত আমার মনে। মনে আছে ঘাটশিলায় জনপ্রিয় লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একবার কিছুদিনের জন্য স্থানীয় পাহাড় ও জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ-সৌভাগ্য হয়েছিল। বিদেশে ক্যাটস্‌কিল নামক পার্বত্য প্রদেশে অরণ্যমধ্যে একবার পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। সেইখানেই নাকি বিখ্যাত গল্পের রিপ-ভ্যান-উইঙ্কল

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে দীর্ঘ কুড়ি বছরের জন্যে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। পাহাড়টি এখনও তাঁর নামাঙ্কিত হয়ে আছে।

বৃক্ষ আর অরণ্যের ছবি আঁকতে ভাল লাগে। ১৯৮২ সালে শুধু অরণ্যচিত্রের একটি প্রদর্শনীও করেছি। অরণ্যের স্নিগ্ধ নিবিড় সৌন্দর্য ও তার নিভৃত প্রশান্তি আমাকে মুগ্ধ করে। তাই সেই ভাল লাগাটা রং-রেখায় বন্দী করার এই দুশ্চেষ্টা।

পরবর্তীকালে বর্তমান যুগের কাছাকাছি এসে সত্তর-আশী সালে দেখছি পরিবেশ-সচেতন পৃথিবী দেখতে পেল অরণ্য যেন ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে দরিদ্র দেশের মানুষ আরণ্য-দারিদ্র্য বরণ করে এক সর্বনাশা বিপর্যয় ডেকে আনতে চায়। সমগ্র জীবজগতে এটা হবে একটা দুর্ঘটনা। এই চিন্তা থেকে পত্র-পত্রিকায় কিছু লিখেছি। সেই প্রবন্ধগুলি এই পুস্তকের জন্ম সূচিত করে।

এ কাজে আমরা অনেকের সাহায্য পেয়েছি। বন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার বন্ধুবর বংশী মান্না ও প্রবীর দাস আমাদের ছবি দিয়ে এবং অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে সাহায্য করেছেন। প্রধান বন-বিশেষজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী অনেক চিত্র, উপদেশ ও তথ্যাদি দান করে আমাদের বিশেষ উপকৃত করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

পরিশেষে শ্রীভূমি প্রকাশন সংস্থার সহৃদয় অরুণ পুরকায়স্থ মহাশয়ের আগ্রহ এবং উৎসাহেই বইটি প্রকাশিত হবার সুযোগ পেল। বইটি পড়ে যদি কারো অরণ্য সম্বন্ধে আগ্রহ জাগে তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব।

ইতি

শৈল চক্রবর্তী

সূচীপত্র

But the glory of trees is more
than their gifts,
T's a beautiful wonder of
line that lifts,
From a wrinkled seed in a
earth bound clod
A column, and arch, in the temple of God,
A pillar of power, a dome of delight
A shrine of song and a joy of sight
Their roots are nurses of rivers
on birth
Their leaves are alive with the
breath of the earth,
They shelter the dwellings of man
and they beng
O'r his grave with the look of
A loving friend.

—Henry Van Dyke

অরণ্যের দিন ফুরালো

॥ অরণ্য প্রাচীন মানুষের চিন্তায় ॥

আদিম যে আরণ্যক ভয়
রক্তে নিয়ে এসেছিনু, আজিও সে-কথা মনে হয়।
—রবীন্দ্রনাথ

প্রাচীন মানুষের কাছে সর্বদেশে ও সর্বকালে অরণ্য একটি ভয়ের ও বিস্ময়ের জগৎ। সেই প্রাক্-সভ্যতার যুগে মানুষ যখন গৃহবাসী হয়নি তার বাসস্থান ছিল অরণ্যে ও গিরিগহ্বরে।

সেই যুগে মানুষ ভয়ের চোখে দেখত অন্ধকারকে। অন্ধকার সব বস্তুকে লুকিয়ে রাখে। তার মধ্যে আছে রহস্য, কত কি অজানা আশংকা—ভূত-প্রেত অপদেবতা ইত্যাদি থাকতে পারে তার মধ্যে। তাই সে ভয়ের। বস্তুতঃ সে দেখেছিল অরণ্যই ত হিংস্র শ্বাপদের বাসস্থান। অলক্ষিতে অরণ্যের গভীর অন্ধকার গহ্বর থেকে কখন যে হিংস্র বাঘ-ভালুক-নেকড়ে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে অরণ্যচারী অসহায় মানুষকে আক্রমণ করবে কে জানে? সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ছিল মানুষের অবচেতনে। বহুযুগের সেই অভিজ্ঞতা থেকে ভীতির জন্ম হল।

কিন্তু বিশাল অরণ্য যে বিস্ময় জাগায় সে তার স্তব্ধতা থেকে। সেখানে একটি কি তুটি মানুষ অতি ক্ষুদ্র অতি নগণ্য। সে একাকী বোধ করে আর অনুভব করে তার চতুর্দিকে একটা স্তব্ধ গম্ভীর জগৎ। অতি ক্ষীণ শব্দই শোনা যায় সেখানে। সেই নিস্তব্ধ রাজ্যে হয়ত

শোনা যায় কোনো পাখির কাকলি, বাতাসে আন্দোলিত পত্রের মর্মর অথবা কোনো আক্রান্ত জীবের আর্ত্তস্বর। সমুদ্রেও মানুষ একাকী। সমুদ্রের দিগন্ত বিস্তারে সে আপনাকে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু সমুদ্রের তুলনায় অরণ্য আরও অনেক নীরব।

সেই আদিম ভয় ও বিস্ময় থেকে জন্ম নিয়েছে কত আরণ্য-দেবতা এবং উপদেবতার কল্পনা যারা মানুষকে বিচিত্র কৌশলে রক্ষা করে আবার মানুষকে কষ্টও দেয় ও যন্ত্রণা-জর্জরিত করে। আর সেই সমস্ত স্পিরিট বা অপদেবতা নিয়ে গড়ে উঠেছে নানান কথা, উপকথা, লোককথা ও পুরাণকাহিনী। গড়ে উঠেছে তাদের ধর্মবিশ্বাস এবং তাই থেকে তাদের জীবনধারণের রীতি ও আচার পদ্ধতি। পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন মানবজাতির পুরাকাহিনীর মধ্যে তারই বহু বিচিত্র প্রমাণ পাওয়া যায়।

যেমন য়ুরোপীয় পুরাকাহিনীতে পাওয়া যায় ওক (oak) গাছের কথা। ওকের পত্রপল্লবের ফাঁক দিয়ে বাতাসের সুরে ভেসে আসে জিউস দেবতার বাণী। দেবতা যেন কথা বলেন। সেই প্রাচীন ওক গাছ কেউ কাটতে যায় না। ভয় পায়। কেননা, বজ্রের দেবতা থরের ভীষণ প্রিয় ওক গাছ। মানুষ ভয় পায় যখন সে শুনতে পায় কবরডাঙ্গার ঝোপ জঙ্গল থেকে প্রতিধ্বনিত হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীর মত কোনো দেবতার গুরুগম্ভীর সংকেত বাক্য।

নর্সম্যানদের প্রাচীন পুরাকাহিনী যেন অরণ্য নিয়েই রচিত। নর্সম্যানরা বিশ্বাস করত পৃথিবী ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছে এক প্রাচীন বিশাল অঙ্গার বৃক্ষ (Ash tree) যার নাম ইয়াগড্রাসিল। সেই সুবৃহৎ পাদপের সুদীর্ঘ শিকড় ত্রিজগতের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে চলে গেছে সুদূর অ্যাসগার্ডে (Asgarrd) যেখানে একমাত্র দেবতাদের বসবাস।

আমেরিকার প্রাচীন রেড ইণ্ডিয়ানরা এক দিক থেকে ধর্মগত প্রাণ ছিল। তাদের ধর্ম-বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুকে অবলম্বন করে। প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যেই তারা দেখত জীবন

আছে, দেবদেবীর অস্তিত্ব আছে। এইসব বস্তুগুলির মধ্যে অরণ্যের বৃক্ষ যেমন ছিল তেমনি ছিল পশুপাখি, পর্বত, নদনদী, সমুদ্রজল ও আকাশ। এই সমস্ত উপাদান দিয়ে কল্পনার সাহায্যে তারা বিশ্ব-সৃষ্টির এক বর্ণবহুল চমৎকার মহান চিত্র রচনা করেছিল। আর একটি মহাদেশের কথা এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে সেটি হল আফ্রিকা। অরণ্যের পাহারায় ছায়াবৃত ঐ দেশ যে শতাব্দীর পর শতাব্দী পশুপাখি জীব-জন্তুদের আশ্রয় দিয়েছে, গাছপালার মত তারাও মানুষের আত্মীয় হয়ে উঠেছে। ঐ দেশের পুরা-কাহিনীতে আমরা পাই অরণ্য জীবন্ত। বনস্পতি শুধু নয়, গাছের ফুল ফলও যেন জীবন্ত হয়ে মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে। নারকেল তেলের বড় ভাঁড় থেকে তেল পড়তে পড়তে সেই তেল রূপ নিল এক সুন্দরী কন্যার। আবার দেখি, রাক্ষুসে লাউ গড়াতে গড়াতে একটি মেয়ের পিছনে ছুটছে, আর বলছে, “মাংস খাব, মাংস খাব”। ওখানে ‘ম্যাজিক’ আছে ‘জুজু’ আছে আবার ‘টাবু’ (taboo) আছে।

॥ বৃক্ষ ও অরণ্য সম্পর্কে ভারতবর্ষ ॥

ভারতবর্ষের অসংখ্য মানুষ নানা জাতি-প্রজাতি এবং নানা ধর্ম-বিশ্বাসে বিভক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বৃক্ষের প্রভাব সাধারণ মানুষের জীবনে কতখানি গভীর তা অনেকেরই জানা আছে। গ্রামের মানুষ আজও একটা প্রাচীন বট বা অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় একটি পাথর বসিয়ে তার গায়ে সিঁদুর লাগায়। তাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে, জল দেয়। কোথাও ঐ গাছের গোড়া সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে মন্দিরের মত দেবতার স্থান করে তোলে। যেখানে সাঁওতাল বা আদিবাসীদের বাস সেখানে কোনো কোনো নির্জন স্থানে বৃক্ষমূলে দেখা যায় পোড়ামাটির বহু ঘোড়া আরও কত কি মূর্তি, হয়ত দেবতার মূর্তিই হবে, জড়ো করে তারা রেখে দেয় এবং সেই স্থানকে পবিত্র বলে মনে করে। সেই বৃক্ষগুলিও পবিত্র।

আমাদের জীবনে অসংখ্য বৃক্ষের মধ্যে কয়েকটি বৃক্ষকে আমরা

পবিত্র জ্ঞান করি। যেমন—তুলসী, বিল্ববৃক্ষ, কদম্ব, বট, অশ্বত্থ ইত্যাদি। পাঁচটি গাছের সঙ্গমস্থলকে আমরা বলি পঞ্চবটি। যেখানে পাঁচটি গাছ—গোড়ার দিকে পরস্পর সংলগ্ন সেটি পবিত্রস্থান। পাঁচটি গাছ হল—বেল, অশ্বত্থ, বট, নিম ও অশোক। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এরূপ একটি পঞ্চবটি তৈরি করে সেখানে বসে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন।

এছাড়া যে কোনো সামাজিক শুভকর্মে বৃক্ষ আমাদের অপরিহার্য। আজও দেখি শিশু কদলীতরু ও ঘট দিয়ে, নারকেলের ডাব দিয়ে প্রবেশদ্বার সাজাতে। ক্রিয়াকর্মে যজ্ঞে সমিধ দিয়ে হোমানল প্রজ্জ্বলিত করতে হয়—ঐ যজ্ঞকাষ্ঠ সাধারণত বেল গাছের কাঠ ছাড়া আর কিছু নয়। পূজা-উপকরণে ফলমূলই প্রধান দেবভোগ্য বস্তু এবং এই ভোজ্যবস্তু দেবতাকে নিবেদনের যে পাত্র তা কদলীপত্র।

আর্য সভ্যতা ভারতে স্থায়ী হবার পর মানুষের জীবনকে যে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল সেগুলি হল, বহ্মচর্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্যাস। তৃতীয়টিতে মানুষকে বনে গমন ও বাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপরেই সব কিছু পরিত্যাগ করে বৈরাগ্য গ্রহণ—সেইটি সন্যাস। সুতরাং দেখা যায়, অরণ্য এদেশে প্রাচীনকালে যেমন সুরম্য স্থান বলে বর্ণিত হয়েছে তেমনি এটি জীবনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসেবে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত ছিল।

॥ ভারতীয় পুরাণকাব্যে অরণ্য ॥

ভারতবর্ষের পুরাণকাহিনী এবং প্রাচীন সাহিত্যে ও কাব্যে অরণ্য একটি বিশেষ এবং ব্যাপক স্থান অধিকার করে আছে। আমাদের প্রাচীন কবি ও সাহিত্যকারেরা বনকে যেভাবে শ্রীমণ্ডিত ও মহিমাদীপ্ত করেছেন সেভাবে অন্য দেশের কোনো কাব্যে ও সাহিত্যে দেখা যায় না। এটি ভারতের একটি বৈশিষ্ট্য।

রামায়নের কথাই ধরা যাক। এই মহাকাব্যে প্রায়ই আমরা বন উপবন ও তপোবনের দেখা পাই। বন কথাটির সঙ্গে 'উপ' ও 'তপঃ'

কথাগুলি যোগ করে বনকে যেন আরো সৌন্দর্যময় ও মহিমান্বিত করা হয়েছে। পিতৃসত্য পালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের চতুর্দশ বর্ষ বনবাস এটিও এমন একটি ঘটনা যাকে কেন্দ্র করে মহাকবি আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ভারতের অসংখ্য নদনদী গিরিপর্বত, বন উপবন ও অসংখ্য অরণ্যের। চিত্রকূট নামে একটি পর্বত কিন্তু সেখানে এক রমণীয় তপোবনও আছে। কবির কথায় বলতে হলে—

“চিত্রকূটে মুনিগণ বৈসে বৃক্ষতলে
মৃগ পক্ষী বন-জন্তু রহে কুতূহলে।”

সপ্তকাণ্ড রামায়ণের একটি কাণ্ডের নামই হল আরণ্য কাণ্ড।

“অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্য স্থান।
তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান ॥”

অগস্ত্যের আশ্রমে বহুদিন বাস করে রাম-লক্ষণ-সীতা চললেন মুনির কনিষ্ঠের কাছে পিপ্পলীর বনে। পিপ্পল কথা থেকে হয়ত পিপ্পলী কথাটি এসেছে। রামায়ণে পঞ্চবটি বনের নাম অতি সুপরিচিত। “পঞ্চবটি দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী।” এই বনের মধ্যে শূর্পনখা থেকে আরম্ভ করে মায়ামৃগ দর্শন এবং শেষে সীতাহরণ প্রভৃতি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। এইরূপ অনেক বন-উপবনে রামায়ণ পরিপূর্ণ। এই সব বনের রমণীয়তার বর্ণনা যুগ যুগ ধরে মানুষকে বিমুগ্ধ করে এসেছে।

মহাভারত নামক আর একটি মহাকাব্যে আমরা অনুরূপ বনের বর্ণনা পাই। সেখানেও বনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কারণ পাণ্ডবেরা অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হবার পর তাঁদের ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস করতে হয়েছিল। এই তের বৎসর বনবাসের সময় তাঁরা ভারতের অনেক বনে গিয়েছিলেন। সেই সমস্ত কাহিনী নিয়ে বিরাট বন-পর্ব রচিত।

মহাভারতেও নৈমিষারণ্যের উল্লেখ আছে। আর একটি বনের নাম পাওয়া যায় তুঙ্গকারণ্য। নানা বৃক্ষের মধ্যে অক্ষয়বট ও বিভীতক বৃক্ষ মাঝে মাঝে এসেছে। গন্ধমাদন পর্বতে পাণ্ডবদের বাসকালে সেখানে আমরা নানা বৃক্ষের সন্ধান পেয়েছি, যথা : আম, আমড়া, নারিকেল, গাব, মুঞ্জাটক, জীবক, দাড়িম, বীজপূরক, কাঁঠাল, ডহুয়া, কদলী, খর্জুর, অম্লবেতস, পরাবত, চম্পক, বিল্ব, কপিত্থ। তাছাড়া বদরী জম্বু, পাকুড়, উডুম্বা, বট, অশ্বত্থ, ভল্লাতক, আমলকী, ইঙ্গুদী, হরিতকী, করমর্দ ইত্যাদি।

তাঁরা সেখানে নানা পুষ্পবৃক্ষও দর্শন করেন, যথা : চম্পক, অশোক, কেতক, বকুল, পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, পাটলী, কুটজ, মনোহর মন্দার, পারিজাত, কোবিদার, শাল, তাল, তমাল, পিপ্পল, ইঙ্গুদী, শাল্মলী, কিংশুক ও ভৃঙ্গরাজ।

নল-দময়ন্তী উপাখ্যানে নলও অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে যথাসর্বস্ব হারিয়ে দময়ন্তীকে নিয়ে বনে প্রবেশ করেন। পরিধেয় পর্যন্ত ছিল না তাঁদের, সেখানে একটি বস্ত্রকে ছুখণ্ড করে ছুজনে পরিধান করলেন। তারপর নলের অন্তর্ধানে দময়ন্তী ভয়ঙ্কর এক বনে প্রবেশ করেন। সে বনে ঝিঁঝিঁ ডাকছিল এবং সে বন সিংহ ব্যাঘ্র রুরু হরিণ মহিষ ভল্লুক ও নানা পক্ষিগণে পরিপূর্ণ। জম্বু লোধ্র অর্জুন নিম্ব তিনিশ প্রভৃতি বহু বৃক্ষ ও অনেক পর্বত অনেক গুহা বহুতর কুঞ্জ যেমন ছিল তেমনি ভীষণ দর্শন এক ব্যাধের কবলেও পড়েছিলেন দময়ন্তী।

অন্য এক স্থানে আমরা খাণ্ডব বনের কথা পেয়েছি। বন যে অগ্নিতে দগ্ধ হয় তাও জেনেছি। একবার অগ্নি হোমানল থেকে উঠে বললেন, "যজ্ঞে ঘৃতাহুতি কেবলই খেতে হচ্ছে আমাকে। সেটা আমার রসনা ও উদরকে তৃপ্তি দিতে পারছে না। অতএব হে অর্জুন, আমাকে ঐ খাণ্ডব অরণ্য ভোজন করাও।" অর্জুন সম্মত হলেন এবং খাণ্ডব বনের চতুর্দিকে পাহারা রাখলেন যাতে বন্য জীব পালিয়ে যেতে না পারে। অগ্নি তৃপ্তি সহকারে সমগ্র খাণ্ডববন দাহন করলেন।

কালিদাস রচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ কাব্যে বন-উপবনের রমণীয়তা

বর্ণনার তুলনা হয় না। আরণ্য আশ্রমের সুশোভন বর্ণচ্ছটায় ঐ স্থান রঞ্জিত। সেই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তপোবন স্থানটি এমন যেখানে স্বভাব এবং তপস্যা, সৌন্দর্য এবং সংযম একত্র মিলিত হয়েছে। সেখানে সমাজের কৃত্রিম বিধান নেই অথচ ধর্মের কঠোর নিয়ম বিরাজমান।"

অরণ্যের গভীরে কেকাধ্বনি বর্ণনাকে রবীন্দ্রনাথ নিজভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন: "নব বর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তারই গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালী বনের দ্বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে মাতৃস্তন্য পিপাসু ঊর্ধ্ববাহু শত সহস্র শিশুর মত অগণ্য শাখা প্রশাখার আন্দোলিত মর্মর-মুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তার স্বরে যে একটি কাংস্য ক্রেংকার ধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জেগে উঠে।"

ভারতের প্রায় সমস্ত কাব্যে ও সাহিত্যে বন-উপবন তপোবনের মাধুর্য মহিমা ছড়ানো। রাক্ষসাদি দুর্বৃত্তের বাসস্থান হিসেবে কোনো কোনো স্থান ভীতিপ্রদ হলেও সামগ্রিকভাবে অরণ্য পাঠকের মনে যতটা ভয় সঞ্চার করে ততোধিক বেশি সে তার চিত্তকে আকর্ষণ করে তার স্তব্ধ গভীর মাধুর্য দিয়ে।

কবি বলেছেন, "শকুন্তলা যখন তপোবন ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে যাইতেছে তখন পদে পদে তাহার আকর্ষণ, পদে পদে তাহার বেদনা। বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্মান্তিক সকরুণ হইতে পারে তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল অভিজ্ঞান শকুন্তলমে চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়।"

রবীন্দ্রোত্তর যুগেও অনেক কবি ও সাহিত্য স্রষ্টার কাছে অরণ্য প্রাধান্য পেয়েছে এবং অরণ্যকে তাঁরা প্রেম ও মমত্ববোধে সিঞ্চিত করেছেন এ তথ্য অনেক পাঠকের জানা আছে।

একটি বিষয় শুধু উল্লেখ করব, সেটি হল কবিত্ব নয়, বাস্তবতার বিষয়। আমরা দেখেছি পুরাণে ও পুরাকাহিনীতে বর্ণিত সেদিনের

উপবন ও তপোবনে যাঁরা বাস করতেন সেই মুনি ঋষিগণ, তাঁদের পত্নীগণ, ছাত্র শিষ্য-শিষ্যা, আশ্রিত বা অতিথি—এইসব মানুষের নানা-প্রকার অভাব এবং সর্বোপরি তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা কি ছিল তা ঠিক জানা যায় না। তাঁরা কি তণ্ডুলাদি সংগ্রহের জন্য বনের সীমানা পার হয়ে লোকালয়ে যেতেন? শিষ্যদের কাষ্ঠ আহরণ করতে দেখা গেছে। কিন্তু পাক করবার অন্যান্য দ্রব্য কিভাবে সংগ্রহ হত? গাভীর উল্লেখ আছে, অর্থাৎ দুগ্ধ যে তাঁদের পানীয় ছিল তা বোঝা যায়। বন-সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্র থাকা অস্বাভাবিক নয়। বরং সেইটাই স্বাভাবিক। গাভীদের জন্য নিশ্চয়ই গোচারণ ভূমি ছিল।

অনেকে সেইজন্য মনে করেন, বনের মধ্যে যেখানে মানুষের বসবাস কিংবা আশ্রম ছিল সেখানে নিশ্চয়ই ফলমূলাদি উৎপাদনের জন্য উদ্যান ছিল। অর্থাৎ এখন আমরা যাকে বলি ফলোদ্যান বা অর্চার্ড (orchard), সেইরকম সুস্বাদু ফলবান বৃক্ষ এবং তৎসহ পুষ্পিত লতার উদ্যান থাকা খুবই স্বাভাবিক। এইসব বৃক্ষলতা আশ্রমবাসীদের যত্নে ও সেবায় লালিত ও বর্ধিত হত এবং তাঁদের সৌন্দর্য-প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ এগুলি তপোবন ও তপোবন সংলগ্ন প্রদেশকে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করে রাখত।



।। প্রাচীন ভারতে অরণ্য ।।

মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন
পূরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ
মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে।
—রবীন্দ্রনাথ

বৈদিক যুগ এখন থেকে ৪।৫ হাজার বছর আগের যুগ। তখনকার মানুষের মনে অরণ্য কেমন প্রাধান্য পেত এবং তার সঙ্গে ব্যবহারিক সম্পর্ক কেমন ছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ কোথাও বিশেষ পাওয়া যায় না। কিছু কিছু অর্থশাস্ত্রে আছে এবং কিছু বিশদ তথ্য আছে মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণে।

মৌর্য সাম্রাজ্যে বন্য প্রাণী ও বনাঞ্চল সংরক্ষণের জন্য আইন ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায়, মৌর্যযুগে দেশের বনাঞ্চল যথাযথভাবে রক্ষা করার জন্য অরণ্যকে আট শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল। বন ও বৃহৎ বৃক্ষপূর্ণ জঙ্গলগুলি হাতির বাসস্থান হিসেবে সংরক্ষিত ছিল। অন্যান্য বনমধ্যে বাঘ সিংহ হরিণ গণ্ডার প্রভৃতি পশু এবং পক্ষিকুল আশ্রয় পেত। এইসব সংরক্ষিত বনে গাছ কাটা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল প্রতি জঙ্গলে একজন করে বন উপাধ্যক্ষের উপর।

মেগাস্থিনিসের বিবরণে আছে মৌর্য রাজাদের নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট প্রাণী শিকার করার অধিকার ছিল। কিন্তু চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা শিকার করতেন না। তাই তাদের জন্য রাজা মহারাজা কতকগুলি



বন দান করতেন। সেই বনের ফলমূলাদি এবং বনজ দ্রব্যজাত কোনো আয় সেই ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য হত।

সম্রাট অশোক পশু শিকার প্রথা একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দেন। অহিংসাকে তিনি একটি ধর্মের অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করেন। ভারতে প্রথম চিড়িয়াখানাগুলি বা পশুশালাগুলি সম্রাট অশোকের সৃষ্টি। পক্ষি মাংস যথা—টিয়া, ময়না, হাঁস, শকুন, ময়ূর, সারস, বক এবং প্রাণী যথা—কাঠবিড়ালী, হরিণ, গণ্ডার, প্রভৃতি খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেন। তাছাড়া বৎসরে ৭২ দিন প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ বলে সম্রাট অশোক ঘোষণা করেন।

গুপ্তযুগে শুক্রাচার্যের তত্বাবধানে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণী আইন-কানুন অবশ্য পালনীয় হিসাবে রচিত হয়েছিল। ময়ূর ও কিছু অন্য পাখি হত্যা করা একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় তদানীন্তন যে বিধিগুলি লিপিবদ্ধ আছে তার সঙ্গে এখনকার সংরক্ষণ বিভাগের নিয়মাবলীর আশ্চর্য মিল রয়েছে। যেমন—অরণ্যের আয়তন বিরাট হলে তাকে ছোট ছোট কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা, এবং গমনাগমনের সুবিধার জন্য অরণ্যমধ্যে পথ নির্মাণ প্রভৃতি।

বন্যপ্রাণী ও বনাঞ্চলের ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয় দুর্বল হিন্দুরাজত্বের শেষ দিকে এবং সেটি আরো গুরুতর আকার ধারণ করে মোগল যুগে।

বাবর-নামা থেকে জানা যায়, এই সময় ধনবান শ্রেণীর ব্যক্তির বিলাসিতা ছিল জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে পশু শিকার করা। সম্রাট আকবর নাকি নিজে এক হাজার চিতাবাঘ শিকার করেছিলেন। এই বন্য-প্রাণী ধ্বংসে ইন্ধন যোগান ইংরেজ শাসনকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহেবরা। এই শ্বেতাঙ্গদের অনুগৃহীত স্থানীয় রাজন্য-সমাজ যোগ দিয়েছিল এই ধ্বংসযজ্ঞে। উভয়ের মিলিত ধ্বংসলীলায় ভারতের প্রায় ২০০ প্রজাতির পশুপাখি চলে যায় অবলুপ্তির পথে।

আজ অবশ্য ফিরে এসেছে সংরক্ষণের শুভদিন। তৈরি হচ্ছে অভয়ারণ্য এবং এগুলি সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অভয়ারণ্যে ৪০০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ১২০০ প্রজাতির পাখি ও ৩৫০ প্রজাতির সরীসৃপ

এবং অসংখ্য কীটপতঙ্গ নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় বাস করছে। ভারতে অভয়ারণ্যের সংখ্যা ২২টি তার মধ্যে একটি পশ্চিমবঙ্গে জলদাপাড়ায়। এখানে ৬৫ কিলোমিটার ঘেসো জমিতে গণ্ডার ও এক প্রকার বাইসন নিশ্চিয়ে বাস করে থাকে।

॥ বাঁচিয়ে রাখে গাছ ॥*

ভারতের নানা স্থানের বন্ধুদের সাদর আমন্ত্রণে আমরা কাশ্মীর থেকে কর্ণাটক যাত্রা করি ; উদ্দেশ্য, চৌদ্দটি রাজ্যের অধিবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ করা। সুযোগও হয়ে গেল অনেক আগ্রহী কর্মীর সঙ্গে সাক্ষাত সম্পর্কের যাঁদের মধ্যে আছেন ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, পরিবেশ আন্দোলনে যুক্ত এমন সব কর্মী, লেখক ও সর্বোপরি গ্রামবাসীরা।

……দেশ জুড়ে যে নতুন সমাজ-বন-সৃজনের নামে বৃক্ষ রোপন আন্দোলন চলছে তার বিরুদ্ধে ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে জনমত গড়ে উঠছে। এই জনমত দ্রুত বর্ধনশীল বৃক্ষ যথা—ইউক্যালিপটাস রোপণের বিরুদ্ধে। এইসব বৃক্ষের অনিষ্টকর দিকটা উপেক্ষিত হচ্ছে। দুঃখের বিষয় উর্বর চাষযোগ্য জমিও এই প্রকল্পের আওতায় আসছে, তার দ্বারা মানুষ ও গবাদি পশুর খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, জমির উর্বরতা যেমন নষ্ট হচ্ছে তেমনি হ্রাস পাচ্ছে বাতাসের আর্দ্রতা।

…উত্তরাখণ্ডে সরকার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে সবুজ গাছ ধ্বংস করা নিষিদ্ধ করেছেন। এটি সফল করতে গ্রাম হতে গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ একটি কার্যকরী উপায় যার দ্বারা স্থানীয় লোকের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এ বিষয়ে আমাদের কর্মীরা বিশেষত হিমাচল প্রদেশের অসাধারণ কর্ম অগ্রণীর ভূমিকায় রয়েছেন।

সুন্দরলাল

*সুন্দরলাল বহুগুণাজীর স্ব-লিখিত মন্তব্যের কিছু অংশ 'Future' পত্রিকা হতে অনুদিত।

॥ পৃথিবীর অরণ্য পর্ব ॥

দিগন্তে রুদ্রের প্রসন্নতা
ঘোষণা করলে মেঘগর্জনে
অবনত হল দাক্ষিণ্যের মেঘপুঞ্জ
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর দিকে।
মরুবক্ষে তৃণরাজি
শ্যাম আস্তরণ দিল পেতে,
সুন্দরের করুণ চরণ
নেমে এল তার পরে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

আমরা এই পৃথিবীকে কি সমগ্রভাবে দেখতে পাই? না, তার একটা ক্ষুদ্র অংশমাত্র চোখে পড়ে।

তাছাড়া তাকে যেটুকু দেখি সেত আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের সময়-সীমার মাপে। ইতিহাসের দৃষ্টিতে তাকে কল্পনা করি শতাব্দীর মাপে। তাতেও তার রূপের পরিবর্তন চোখে পড়ে না।

লক্ষ কোটি বর্ষের মাপে কে দেখবে তাকে?

তাই তার ভাঙ্গা-গড়া এবং বিচিত্র পরিবর্তন আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

জন্মের পর থেকে পৃথিবীর বাল্যকাল কেটেছে উদ্দাম উন্মত্ততায়। কখনো অগ্নিদাহের প্রচণ্ড আগ্নেয় নিস্রাবে সে বিদীর্ণ করতে চেয়েছে নিজেকে। কখনো সহস্রবর্ষ ব্যাপী ধারা-বর্ষণে সে প্লাবিত হয়েছে। আবার কখনো সারা দেহ উন্মথিত করে নিজ অঙ্গে সৃষ্টি করেছে উত্তুঙ্গ-পর্বত এবং অতলস্পর্শ সমুদ্র—এইভাবে বারবার সে তার মানচিত্র

গড়ে নিয়েছে নিজে নতুন করে। এ ইতিহাস কোটি কোটি বছরের।

বিজ্ঞানীরা মোটামুটি চারটি যুগে ধরেছেন এই ইতিহাসকে। প্রথমটি হল মুহুর্মুহু লক্ষ আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা উদ্গীরণ আর অতলান্ত সমুদ্র—এইটিকে বলা হয় প্রাইমারী যুগ বা Palesoic Age। আবার রঙ্গমঞ্চের পট পরিবর্তন। জ্বালামুখ নির্বাপিত এবং বায়ুমণ্ডল হতে শ্রান্তিহীন বর্ষাধারা—এটি হল জীব-সৃষ্টির যুগ বা সেকেণ্ডারী যুগ অথবা Mesososic Age। তৃতীয় পর্যায়ে এরপরে এল উদ্ভিদ ও বৃক্ষ সৃষ্টির বিপুল উদ্যোগ বা Tertiary Age। এবং তারপর গ্লেসিয়ার হিমবাহ ও বরফের তুহিন যুগ Quarternary Age, এই যুগে উদ্ভিদ হতে জীবের বিবর্তন ধারা চলতে চলতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব।

লক্ষ কোটি বর্ষের মধ্যে পৃথিবী কতবার যে তার বেশ পরিবর্তন করেছে তার হিসেব রাখবে কে? কতবার যে তার শ্যাম আস্তরণ পাতা হয়েছে এবং কতবার তা জলপ্লাবনে মিশে গেছে মাটির সঙ্গে। চলে গেছে মাটির তলায়—এ ঘটনার কিছু আভাস আমরা পাই মাটির গভীরে খনির মধ্যে কয়লার স্তর বিন্যাস থেকে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, এখন থেকে প্রায় ৪০ কোটি বছর আগে প্রথম বৃক্ষের জন্ম। প্রাথমিক উদ্ভিদ থেকে অনেক গাছের প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে এবং তার সঙ্গে এল অরণ্য। সেই নিবিড় ও গভীর অরণ্য এক টানা পৃথিবীকে ঢেকে রাখে ১২ কোটি বছর ধরে। তারপর আসে তুষার যুগ। সমস্ত পৃথিবী বরফে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বরফের চাপে গাছপালা নিশ্চিহ্ন হল। একটি তৃণও কোথাও জেগে ছিল না।

বরফের পালা শেষ হতেই উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়া ছেয়ে ফেলল পৃথিবীকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে গজিয়ে ওঠা উদ্ভিদ সারা পৃথিবীকে আবার ঢেকে দিল অরণ্যে। সে অরণ্য ঘন ও নিবিড়। দানবীয় আকৃতির মহীরুহ আর নানাজাতীয় লতা ও ফার্ণ গাছে পরিপূর্ণ। এত

নিবিড় অরণ্য আর নাকি কোনোদিন হয়নি। সেই মহীরুহপূর্ণ অরণ্য বিশ্বময় কয়লার স্তরে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এই বনপর্ব কিন্তু ২৫/৩০ কোটি বছর আগের ঘটনা। এই বন বালিতে চাপা পড়ে উন্নত মানের কয়লা হল। এই সময় টেরিডো-স্পার্ম শ্রেণীর গাছপালার প্রাধান্য দেখা গিয়েছিল। তারপর ১৩/১৪ কোটি বছর ধরে চলেছিল এই কয়লাযুগ। এই যুগের অবসান ঘটে আবার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে আর ঘন ঘন ভূকম্পনে। ভূমিকম্প ও অগ্নিস্রাব কমার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আর এক বিপর্যয়—অনাবৃষ্টি ও অস্বাভাবিক খরা। যেসব গাছপালা এতগুলি দুর্যোগে বেঁচেছিল তারাও নিশ্চিহ্ন হল খরার প্রভাবে। পৃথিবী যেন পরিণত হল এক দিগন্তজোড়া মরুপ্রান্তরে।

আরও অনেক পরে। আজ থেকে ৩/৪ কোটি বছর আগে ধরণীর আবহাওয়া বদলে গেল—হল উষ্ণ ও আর্দ্র। অনুকূল পরিবেশ পেয়ে আবার অরণ্যে অরণ্যে সবুজ হয়ে উঠল পৃথিবী।

কিন্তু এখানেই ত শেষ নয়। আবার এল তুষারযুগ বরফে চাপা পড়ল সব গাছপালা। তৃতীয় অরণ্য পর্ব এইভাবে শেষ হল। কিন্তু একেবারে শেষ হল না। তুষার যুগের অবসানে পৃথিবী আবার পূর্ণ হয়ে উঠল অরণ্যে। আদি মানুষ এই বনেরই মানুষ। এই বন ক্রমে ক্রমে আধুনিক অরণ্যের রূপ নিল।

॥ অরণ্যের বিভিন্ন রূপ ॥

সেদিনের পৃথিবীর সমস্ত ভূমিই বনভূমি। মাঝে মাঝে কিছু তুষারক্ষেত্র আছে। কিছু বা মরুভূমি আছে তাদের বাদ দিলে সর্বস্থানই সবুজে ঢাকা। তবে বনের চেহারা দেশ জলবায়ু হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন। নিরক্ষীয় অঞ্চল নিরক্ষরেখার দু'পাশের কর্কটক্রান্তি ও মকর-ক্রান্তি পর্যন্ত প্রসারিত। এ অঞ্চল গ্রীষ্মপ্রধান। আফ্রিকা, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় কতকগুলি দ্বীপপুঞ্জ—এই অঞ্চলভুক্ত। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল ও আমাজনিয়ার নিবিড় বনরাজি এই একই গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যে পড়ে।

ভারতের জলবায়ু উচ্চতা ও বৃষ্টিপাত এইগুলির তারতম্যের উপর নির্ভর ক'রে অরণ্যের নানা বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। প্রধানত বৃষ্টি-পাতের সঙ্গেই উদ্ভিদের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশী। তাই অধিক বৃষ্টিপাত যেখানে সেখানকার বৃক্ষের সঙ্গে সামান্য বৃষ্টিপাত অঞ্চলের উদ্ভিদের কোনো মিল নেই। উচ্চ পর্বতের সঙ্গে সমভূমি কিংবা নিম্নভূমির সাদৃশ্য প্রায় থাকে না। হিমালয়ের নিম্ন অংশে চিরহরিৎ ও কিছু পর্ণমোচী বৃক্ষ দেখা যায়। কিন্তু অধিক উচ্চতায় সরলবর্গীয় বৃক্ষের প্রাধান্য। আবার তার উপরে তৃণভূমি।

ভূমধ্যসাগরীয় বনের পাশে আছে ঘাস বন। সাভানা পাম্পাস প্রভৃতি তৃণভূমি এইসব এলাকা জুড়ে আছে। এই তৃণভূমির মধ্যে চলে তৃণভোজী পশুদের লালনপালন। উত্তর আমেরিকার ও অস্ট্রেলিয়ার বড় বড় খামার বা 'র‍্যাঞ্চ' (Ranch) এই তৃণভূমির মধ্যে পড়ে।

মেরুবৃত্ত ও তুষারক্ষেত্রের কাছাকাছি অবস্থান করছে তুন্দ্রাভূমি। তৃণভূমির পাশেই রয়েছে সেটি। তুন্দ্রা অঞ্চল শীতকালে বরফে চাপা পড়ে। শীতের পর বরফ গললে ছোট আকারের গুল্মজাতীয় গাছপালা হয় সেখানে।

ভারতের বন গ্রীষ্মকালীয় বন। পূর্বে নদীর অববাহিকা বাদ দিলে প্রায় সারা দেশই অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। ক্রমে ধীরে ধীরে বন কেটে গ্রাম-গঞ্জ-শহর গড়ে উঠেছে। বনের এই অস্বাভাবিক প্রাচুর্যের জন্যই মনে হয়, ভারতীয় সভ্যতাই যেন অরণ্যনির্ভর ছিল এককালে। পশ্চিম ভারত ও পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যে মরুভূমি এখন বিরাজ করছে সেখানে ছিল এককালে গভীর অরণ্য। এমনি করে সৃষ্টি হয়েছে রাজস্থানের থর মরুভূমি। বর্তমানে গুজরাট ও পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ প্রদেশ মরুপ্রায় অঞ্চলে পরিণত হতে চলেছে।

।। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে ।।

ভারতের সমগ্র বনাঞ্চলকে বৃক্ষশ্রেণীর প্রকারভেদ অনুযায়ী অন্তত ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই বৈচিত্র্য ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু এবং মৃত্তিকার উপর নির্ভরশীল।

১। চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য—হিমালয় অঞ্চলের পূর্ব অংশের পাদদেশে, পশ্চিম ঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে নানাপ্রকার চিরহরিৎ বৃক্ষের প্রাচুর্য। এর সঙ্গে বাঁশ বেত ফার্ণ প্রভৃতিও প্রচুর জন্মায়। এইরূপ বনকে বহুতল-বিশিষ্ট (multistoreyed) অরণ্য বলা যায়। এরূপ অরণ্যে মূল্যবান আবলুস, গর্জন, শিশু, চাপলাস, তুনপুণ রোজ-উড প্রভৃতিও জন্মায়।

২। মৌসুমী মিশ্রবৃক্ষের অরণ্য—হিমালয়ের নিম্ন অংশ তরাই ও ডুয়ার্স।' উত্তর ভারতের সমভূমির পূর্বাংশ। মধ্যভারতের এবং দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আছে এই অরণ্য। এখানকার অধিকাংশ গাছ পর্ণমোচী ও কতক চিরহরিৎ জাতীয় (যে গাছের পাতা শীতের শেষে সব ঝরে যায় তাকে পর্ণমোচী এবং যে গাছের পাতা মোটেই ঝরে না তাকে চিরহরিৎ বলা হয়)। এই অঞ্চলের গাছ মৌসুমী অরণ্য নামেও পরিচিত। এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় খয়ের, হলুদ লরেল, অর্জুন, গামার, জারুল, শিরীষ, হরীতকী, কুল, পলাশ, কুসুম ইত্যাদি।

৩। সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য—হিমালয়ের ২০০০ থেকে ৩০০০ ফুট উচ্চতায় মৃদুশীতল জলবায়ুতে পাইন, ফার, দেবদারু, সিডার প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি বিস্তীর্ণ। ভারতের সমগ্র বনভূমির মাত্র ৬% এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই অরণ্যের কাঠ কোমল কিন্তু মূল্যবান। বিভিন্ন শিল্পে এবং আসবাবপত্র নির্মাণে এই কাঠের চাহিদা বিপুল।

৪। উপকূলের লবণাক্ত মৃত্তিকা অঞ্চলের অরণ্য—উপকূলের প্রধানত ব-দ্বীপের লোনামাটিতে আছে সুন্দরী, গরান, গেঁওয়া, কেয়া প্রভৃতি গাছের বন। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপের দক্ষিণ অংশের সুন্দরবন বিখ্যাত। এই সকল গাছের কাঠে আসবাবপত্র ভাল না হলেও জ্বালানি হিসাবে এদের প্রচুর চাহিদা।

৫। তৃণ ও গুল্ম অঞ্চল—উত্তরে পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে কর্ণাটক এবং পশ্চিমে গুজরাট থেকে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অংশে বৃষ্টিপাত বেশি



চারাগাছের সুন্দর অরণ্য



ঝাড়গ্রামের শালবন

হয় না। তাই এখানে তৃণ ও গুল্মের প্রাধান্য, মাঝে মাঝে বড় গাছ এখানকার কয়েক প্রকার বড় ঘাস শুধু কাগজ ও বোর্ড তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।

৬। মরুপ্রায় অঞ্চল—রাজস্থানের শুষ্ক ও মরুপ্রায় অঞ্চলে করল্য, ফনিমনসা প্রভৃতি কাঁটা গাছ ও নিকৃষ্ট ধরনের তৃণ জন্মায় যার চাহিদা ও ব্যবহার প্রায় কিছুই নেই।

হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলের বনভূমিকে আমাদের দেশের সম্পদ বলা যেতে পারে। সেখানে দীর্ঘবিস্তৃত এলাকায় যে বৃক্ষ সমষ্টি বিরাজ করছে তাদের জাতি ও প্রজাতির সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। হাজার হাজার বিভিন্ন ও বিচিত্র বৃক্ষের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাধিক পরিচিত তাদের একটি তালিকা দেবার চেষ্টা করছি।

চিলাওনি, আম, চিকরাশি, তুঁতগাছ (Mulberry), শাল, ধুপি (Crypto maria Japonica), পিপলি, কদম, জারুল, শিমুল সতিশাল (Rosewood), শিশু আকাশমণি (Acacia Auriculi Formis রবীন্দ্রনাথ এই গাছের নাম দিয়েছিলেন 'সোনাঝুরি,), হিজল ও পাণিশাল।

ধুপি গাছটির একটু ইতিহাস আছে। এটি ভারতের গাছ নয়। কেউ বলেন জাপান থেকে এটি এসেছে, যিনি এনেছিলেন তাঁর নামটি একটু অদ্ভুত, ফরচুন (Fortune)। তিনি ভারত, চীন ও জাপানের মধ্যে বন সংক্রান্ত ব্যাপারে যাতায়াত করতেন। তাঁর প্রথম সফরে তিনি নাকি এই গাছটি নিয়ে আসেন আর চীনদেশ থেকে নিয়ে আসেন চায়ের বীজ। এ ঘটনা প্রায় দেড়শ বছর আগে হয়।

এবার কয়েকটি সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছের নাম করা যেতে পারে। এ গাছ সবগুলিই বড় গাছ এবং প্রত্যেকটি ফুলে ফুলে যখন ভরে যায় তখন অরণ্যপ্রদেশ এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে।

হলুদ টাবাবুইয়া, পলাশ, টাবাবুইয়া পেণ্টাফাইলিয়া, ক্যাসুয়ারিনা (ঝাউ), অশোক, ইণ্ডিয়ান কর্ক (ব্রহ্মদেশের গাছ) সিলভার ওক

(বড় বড় সুদীর্ঘ গাছ), পাহাড় ও পার্বত্যভূমিতে জন্মায়। এদের পাতার নীচের দিকে উজ্জ্বল রূপোলি রং লাগানো মনে হয়। জাকারাণ্ডা (উঁচু হয়ে ওঠা সুদীর্ঘ গাছ), ফুলের সময় অপূর্ব সুন্দর হাল্কা বেগুনি রঙের ফুলে ভরে যায়।)

পেলটোফর্ম (হলুদ রঙের ফুল, বাংলায় বলে রাধাচূড়া। ফিলিপিন থেকে এসেছে। ঘন পত্রবিশিষ্ট ছায়াময়, তামাটে রঙের ফল—ডাল থেকে ঝুলতে থাকে।)

গুলমোহর বা গুলমোর (জন্মস্থান মাদাগাস্কার। লাল আলতা রঙের (Scarlet, Crimson) ফুল পল্লবে পল্লবে ফুটে গাছটিকে মনোরম সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। ফুল ফোটার সময় এপ্রিল-মে মাস।)

পলাশ—(লাল-লাল ফুলে গাছের সর্বাঙ্গ ভরে যায়।)

মানাবৃক্ষ (ভারতবর্ষের গাছ। আসাম, বিহার ও বাস্তারে বেশি জন্মায়। ফুল ফুটলে অরণ্যে যেন অগ্নিশিখার মত জ্বল জ্বল করে। আদিবাসীরা এর ফুল থেকে একপ্রকার মদ তৈরি করে।)



॥ অরণ্য—আধুনিক মানুষের চিন্তায় ॥

একদিন এসেছিলে আদিবনভূমে,
জীবলোক মগ্ন ঘুমে,
তখনও মেলেনি চোখ
দেখেনি আলোক।
সমুদ্রের তীরে তীরে শাখায় মিলায়ে শাখা
ধরার কঙ্কাল দিলে ঢাকা।
—রবীন্দ্রনাথ

আধুনিক মানুষ বলতে অনেক স্তরের মানুষকে বোঝায়। শহরের মানুষ, গ্রামের মানুষ—তাছাড়া অরণ্যের মধ্যে কিম্বা আশে-পাশে যেসব চাষী বা শ্রমজীবী বা আদিবাসী বাস করে—তাদেরও বোঝায়। তাছাড়া আছে শিক্ষিত শ্রেণী এবং নিরক্ষর।

সকলের কাছে অরণ্য এক অর্থে উপস্থিত হয় না। শহরের ও গ্রামের মানুষকে যদি ধরা যায়, দেখা যাবে, অরণ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা খুব বেশী লোকের নেই। অনেকে অরণ্যকে যেকোনো জঙ্গল বা কয়েকটি বৃক্ষের সমষ্টি ভাবতে পারেন। যাঁদের দেশভ্রমণের সখ আছে তাঁরা অনেক সময় কয়েকটি সংরক্ষিত অরণ্য দেখতে গেছেন। মুখ্যত তাদের উদ্দেশ্য সেখানকার বন্য প্রাণী (Wild life) দেখার। হিংস্র শ্বাপদ, যেমন বাঘ সিংহ কেমন মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতির পরিবেশে ঘোরা ফেরা করে সেইটাই তাঁদের দ্রষ্টব্য। তাঁরা তাঁদের ক্যামেরার সদ্ব্যবহারও করে থাকেন।

অরণ্য অনেকেই দেখেছেন কিন্তু খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই



অরণ্যের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছেন। কিম্বা অরণ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত আছেন। একটা ছোট পাহাড় কিম্বা পাথরের স্তূপ যে আকর্ষণ সৃষ্টি করে অরণ্যের একটি বনস্পতি তার চেয়ে বেশি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনি। গাছ ত প্রকৃতির সৃষ্টি, ছোট থেকে বড় হচ্ছে, তাকে কাটলে কাঠ হয়—এইটুকু শুধু জানা। তার সঙ্গে যে আমাদের তথা সমগ্র জীবজগতের অচ্ছেদ্য একটি সম্পর্ক আছে এবং সেই সঙ্গে সে যে আকাশ বাতাস রৌদ্রালোক এবং বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত, এ তত্ত্ব অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। তাইত দেখি একটি প্রকাশ্য স্থানে একটি সজীব বনস্পতি অসদুদ্দেশ্যে কর্তিত এবং অপহৃত হলে সাধারণের মধ্যে প্রতিবাদ ধ্বনি সোচ্চার হয়ে ওঠে না। এইভাবেই যে কত মূল্যবান বৃক্ষ লুপ্ত হয়েছে তার হিসাব কে করবে?

বনজঙ্গলের আশেপাশে যেখানে দরিদ্র মানুষ কিম্বা আদিবাসীদের বাস সেখানে দেখি জঙ্গলের প্রতি তাদের একটা অন্তরের টান। কারণটা স্বাভাবিক, জঙ্গল তাদের অভাব মেটায়, তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় জঙ্গল। বনের গাছ কেটে সে ঘর বাঁধে, লাঙ্গল বানায়, হাটে কাঠ বিক্রী করে এবং গাছের ডালপালা শুকিয়ে শুকনো কাঠ তাদের রান্নার চুল্লী জ্বালিয়ে রাখে। তারা বন জঙ্গলকে ভালবাসে বন্ধুর মত। আত্মীয়ের মত। কিন্তু তারাই আবার বনের গাছ কাটে, ধীরে ধীরে বনকে ধ্বংস করতে থাকে।

আর এক শ্রেণীর কাঠের ব্যবসায়ী আছে যারা অতি মুনাফা খোঁজে, তারা অরণ্য সম্বন্ধে আগ্রহশীল। শাল, সেগুন প্রভৃতি জাত-কাঠ, দামী কাঠের জঙ্গল তারা ইজারা নেয়। এইসব টিম্বার-ব্যবসায়ী ও তাদের নিযুক্ত ঠিকাদার শ্রেণী সবাই কাঠের মূল্য বেশ বোঝে, কিন্তু অরণ্যের মূল্য বোঝে না। গাছের গায়ে তারা কুঠার হানে, করাত চালায়—অরণ্যকে অবলুপ্তির দিকে ঠেলে দিতে তাদের গায়ে লাগে না। তাদের ধারণা, কাঠ সরবরাহ করা—এইত কাজ অরণ্যের। গাছের দাম দিয়ে বিচার করে তারা অরণ্যের মূল্য। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি আমরা আজ এই আধুনিক কালে। জমি যখন এত প্রয়োজনীয় তখন অরণ্যকে রেখে কি লাভ! কাঠ ত কেনা যায় কিন্তু জমির মূল্য যে অনেক। সুতরাং গাছ কেটে অরণ্য সাফ করে চাষ করলে' বা বসত বানালে ক্ষতিটা কি? জঙ্গল আর কোন্ কাজে লাগছে?

এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে এসেছেন এ যুগের বিজ্ঞানীরা। গত পঞ্চাশ দশক থেকে সারা পৃথিবীর মানুষ অরণ্যকে প্রথম দেখল যেন ঘুম-ভেঙে-ওঠা নতুন চোখ দিয়ে। সে যেন তাকে নতুন করে আবিষ্কার করল ১৯৭২ সালে স্টকহোম কনফারেন্সে। আবিষ্কার করল যখন সর্বনাশ চরম হতে চলেছে। পরিসংখ্যানে বলছে, পঞ্চাশ দশক থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বনসম্পদ যা ছিল তার অর্ধেক লুপ্ত হয়ে গেছে। গড়ে উঠল পরিবেশ বিজ্ঞান। শুরু হল ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের নানা জল্পনা, নানা প্রচেষ্টা। বিশেষজ্ঞরা আজকের পৃথিবীর মানুষকে সচেতন হবার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা অরণ্যকে দেখেন এক বৃহৎ পটভূমিকায়। তাঁদের চোখে অরণ্যের তাৎপর্য অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। গত ৩/৪ দশক জুড়ে নানা পরীক্ষা ও গবেষণার পর তাঁরা অরণ্য সম্পর্কে বহু তথ্য উদ্ঘাটিত করেছেন এবং সেগুলি জনসাধারণেরও জানা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেন।

এই যে অরণ্যের সঙ্গে আকাশ বাতাস ও সূর্যালোকের এক নিবিড় সম্পর্ক, এর ফলেই না গাছের সবুজ পাতা সৌররশ্মির সাহায্যে বাতাসের কার্বন গ্রহণ করে অক্সিজেন বিমুক্ত করে বায়ুকে দূষণমুক্ত করছে। এ তত্ত্ব আমরা জেনেছি বিজ্ঞানের আনুকূল্যে এবং এও জেনেছি যে, সেই অক্সিজেন আমাদের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। আরও জেনেছি যে, এই বায়ুদূষণকে রুখতে প্রতিষেধকরূপে অরণ্যের সবুজ-পত্র ছাড়া আর কেউ নেই।

জেনেছি এমন বনাঞ্চলও আছে যেখানকার সমুন্নত বৃক্ষরাজি মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণে সহায়ক হয় এবং এর ফলেই না জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করার

কল্যাণকর দায়িত্ব সে পালন করে। আজ সেই তরুশ্রেণী যদি নির্মূল হয়ে যায় তাহলে অনাবৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী হবে না কি?

আধুনিক কালের বিশেষজ্ঞের কাছে আমরা জেনেছি যে, গভীর বনাঞ্চলের ভূমি সব সময়ই গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ। এক একর অর্থাৎ তিন বিঘার মত জমিতে কয়েকশো মূল্যবান বড় গাছ থাকতে পারে। তার সঙ্গে থাকতে পারে ঝোপ-ঝাপ ও হাজার দশেক চারা গাছ। আবার এই সংখ্যার দশগুণ অর্থাৎ এক লক্ষ সংখ্যক ক্ষুদ্র জীব পোকা-মাকড়, কেঁচো প্রভৃতি মাটির তলায় বাস করে, তার পর ঐ সংখ্যার দশগুণ অর্থাৎ দশ লক্ষ নানা জাতীয় সূক্ষ্ম জীবাণু—ফাঙ্গাস (fungus), ব্যাক্‌টিরিয়া (bacteria) প্রভৃতি ঐখানে যে অবস্থান করছে না তা কে বলবে?

একজন বিজ্ঞানী তাই বলেছেন, "বনভূমির কোন স্থানে আপনি যদি মাটির উপর দাঁড়ান তাহলে অন্ততঃ এক লক্ষ কীটানুকে আপনার পায়ের নীচে চাপা দিয়ে দাঁড়াতে হবে।" এই সব জীবেরই যথাযথ ভূমিকা আছে। উর্ধ্বদেশ হতে ঝরা পাতা, পত্রপল্লব ও কুসুমদল মাটিতে পড়ে জমতে থাকে। কিন্তু সেগুলি শহরের ডাস্টবিনের জমা ময়লার মত বাতাসকে দূষিত করে না। দুর্গন্ধও ছড়ায় না। কিছুদিন পরে মাটিই তাদের জীর্ণ করে নেয় তার জীবাণু কর্মীদের দিয়ে। তারপর সেই ময়লাগুলো (garbage) মূল্যবান সারে পরিণত হয়। সেই সার কাজে লাগে ভবিষ্যতের চারা গাছগুলি সবল ও সতেজ করতে। প্রকৃতি নিজেই তাদের জন্ম ও বৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করেন দক্ষ প্রসূতির মত। ফলে, বর্তমান বৃক্ষশ্রেণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও নূতন মহীরুহ মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং পূর্বতনদের স্থান পূরণ করবে।

মাটির উপর দণ্ডায়মান ঐ যে বৃক্ষ, ও কি অকারণে দাঁড়িয়ে আছে? মোটেই নয়। তার শিকড়গুলি মাটির গভীরে প্রবেশ করে রস সংগ্রহ যেমন করে তেমনি সেই সঙ্গে সে আর একটি গুরুতর কাজে ব্যাপৃত থাকে। তার শিকড়ের তন্তুজাল বহু দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে। সেই বন্ধন ছাড়িয়ে মাটি পালাতে পারে না যতই

না তাকে বর্ষার জলস্রোত টানুক না কেন! অরণ্য এইভাবেই ভূমিক্ষয় রোধ করে। ভূমিক্ষয় (erosion) নামক সর্বনাশা পর্বটির শুরু হয়েছে অরণ্য বিলুপ্তির পর থেকে।

এদেশে ইংরেজ এসে যখন শাসনব্যবস্থা কায়েম করে তখন প্রথম-দিকে ওদের বনসংক্রান্ত বিষয়ে কোন ধারণা স্পষ্ট ছিল না। অথচ ভারতবর্ষ বিশাল অরণ্যে ভরা। কিছুদিন পরেই ওরা বুঝল Forest থেকে প্রচুর আয় এবং রাজস্ব (revenue) আদায় করা যায়—তখনই ওরা বনজঙ্গল সম্বন্ধে যত্নবান হল। লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৫ খ্রীঃ বন-সংরক্ষণ আইন প্রবর্তন করেন। স্বাধীনতা লাভের পর এখনও অরণ্য হল ভারত সরকারের একটি প্রচুর অর্থপ্রদানকারী বিভাগ। অনেক অরণ্য বিলুপ্ত হয়েও ভেবে দেখুন, কাশ্মীর অরণ্য থেকে সম্প্রতি ৪০ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়া গেছে। শুধু রাজস্ব নয় তাছাড়া অরণ্যজাত দ্রব্যের বিক্রয়কর থেকেও রাজস্ব কম আসে না।

প্রসঙ্গত অন্য একটি দেশের কথা বলছি, এটি হল য়ুরোপের একটি দেশ সুইট্জারল্যাণ্ড। এখানে জুরা নামক এক পর্বতের পাশে অরণ্য এবং তৎসংলগ্ন একটি গ্রাম, নাম জুরিয়েন। গ্রামে বেশি লোক নেই—মাত্র ৪০০ জনের বাস। এই বনানীর আয়তনও বড় নয়—মাত্র দেড় বর্গমাইল। কিন্তু এই অরণ্যজাত দ্রব্য থেকে এত আয় হয় যে, ঐ গ্রামের বাসিন্দাদের একটি পয়সা কর দিতে হয় না। তদুপরি তাদের কর্মসংস্থান হয় ঐ অরণ্যকে কেন্দ্র করে।

অরণ্যজাত দ্রব্য সম্বন্ধে আধুনিক মানুষ বেশ সচেতন। সুন্দর-বনের মধু পেলে আমরা আর কোন মধু কিনে খাই না। বিজ্ঞানীরা এখন বৃক্ষকে নিয়ে নানা গবেষণায় ব্যাপৃত। বহু নূতন নূতন তথ্য এখন মানুষের সামনে উদ্ঘাটিত হচ্ছে এবং এক বিশেষ রসায়নবিদ্যার উদ্ভব হয়েছে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'অরণ্যরসায়নবিদ্যা' বা Sylvi-chemistry।

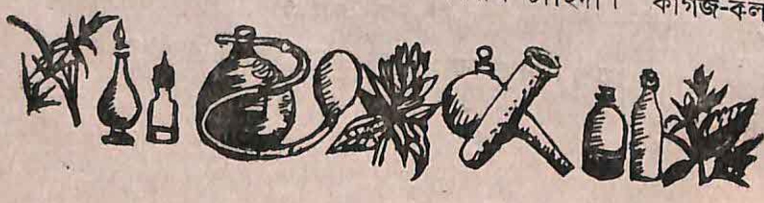
॥ সিলভিকেমিষ্ট্রী (Sylvichemistry) ॥

Forest is a peculiar organism of unlimited
Kindness and benevolence that makes no demand
For its sustenance, it extends generously
The products of its life-activity, it affords
Protection to all beings offering shade even to
To the axe-man who destroys it.

—Goutama Buddha

কাগজ কিভাবে তৈরী হয় অনেকের নিশ্চয়ই জানা আছে। একপ্রকার লম্বা ঘাস, বাঁশ ও কাঠ—এগুলির যে কোনোটি বা সবগুলির মিশ্রণ থেকে কাগজের উৎপত্তি। কাঠই ধরা যাক, কাঠকে যান্ত্রিক বিবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা মণ্ডরূপে পরিণত করা হয়। সেই মণ্ড আবার তরলীকৃত করে সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট চালুনির মত সমকোণী আয়তক্ষেত্র পাত্রে ঢালা হয়। তারপর জলীয় পদার্থ নির্গত হয়ে গেলে সেই চালুনির উপরিস্থ কঠিন সমতল বস্তুটি দুইটি রোলারের মধ্য দিয়ে বিপুল চাপে মসৃণ করে কাগজে পরিণত করা হয়। পদ্ধতিটা অতি সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করলাম। আসলে আরো বহু বিচিত্র পদ্ধতির মধ্য দিয়ে কাঠের মণ্ডকে বিভিন্ন প্রকারের গুণ বিশিষ্ট করে (quality) কাগজে রূপান্তরিত করা হয়।

কাগজের ব্যবহার যেমন নিত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি কাগজ তৈরীর কারখানাও আকারে বাড়ছে এবং সংখ্যায় বর্ধিত হচ্ছে। পৃথিবীর সর্বদেশে এখন কাগজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা। কাগজ-কল



বা (Paper mill) বিশেষত সেই সমস্ত স্থানে বসানো হয় যেখানে কাঁচা মাল যথা বাঁশ বা কাঠের অভাব হবে না।

বড় একটি কাগজকলে কাঁচামাল হিসাবে গাছগাছালি পরিমাণে এত বেশি লাগে যে, তার পুরো যোগান দিতে ছোটখাটো একটি অরণ্য নির্মূল হতে বেশিদিন সময় লাগে না। তবে কাগজকলে কাগজ ছাড়াও এখন অন্য পদার্থ তৈরী হয়। আমরা এবার সেই প্রসঙ্গে আসব।

মার্কিন দেশে ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়াতে (West Virginia) একটি উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চালিত কারখানার নাম পেপার এণ্ড পালপ কোং (Paper and Pulp Co.)। এদের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, কাঠকে মণ্ডে পরিণত করার সময় যে তরল অংশ বাতিল করা হয় সেটিকে ফেলে না দিয়ে তা থেকে অনেক রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এখন প্রতি বৎসর ঐ প্রতিষ্ঠান সেই সমস্ত মূল্যবান দ্রব্য থেকে প্রায় ১৭ কোটি টাকার মত অর্থ লাভ করছে। এটা যে ঐ কোম্পানির বাড়তি লাভ তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সে যাই হোক, এটাও সত্য যে ঐ রাসায়নিক দ্রব্যগুলি মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করছে।

বৃক্ষকে অবলম্বন করে এইভাবে এক বিশেষ রসায়নবিদ্যা গড়ে উঠেছে—তার নাম দেওয়া হয়েছে বৃক্ষ-রসায়নবিদ্যা বা Sylvichemistry। এই শাস্ত্র দ্রুতলয়ে নানা গবেষণা দ্বারা এখন যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, "দেখা যাচ্ছে যে, একমাত্র কাষ্ঠ থেকে যে কত রকম রাসায়নিক বস্তু (chemical) পাওয়া যেতে পারে তার সংখ্যা বলা সহজ নয়। যেমন, প্রধান তিনটি পদার্থ হল, এসেটিক এসিড (Ascetic acid), দ্বিতীয় মেথান্‌ল প্রপায়োনিক এসিড (Methanol propionic acid), এবং তৃতীয় মিথাইল এসিটোন (Methyl Acetone)।

আরও জানা গেছে, কাঠ থেকে পাওয়া একটি পদার্থ লিগ্‌নিন (lignin), এটি থেকেই নাকি কয়েকশো কেমিক্যাল পাওয়া যায়।

কতকগুলির মধ্যে আছে ফেনোলিক কম্পাউণ্ড (phenolic compound) আর কতকগুলি হল পেণ্ট ও বার্ণিশের (Paint and Varnish) উপাদান।

লিগনিন থেকে যে আর একটি বিখ্যাত রাসায়নিক (chemical) পদার্থ জন্মলাভ করে তার নাম ডাই-মিথাইল সালফক্সাইড(Dimethyl sulphoxide)। নামটা কটমট হলেও এটি চিকিৎসা জগতে যুগান্তর এনেছে, কারণ এ থেকে আবার যা তৈরি হয় সেগুলি উচ্চমানের বেদনা-নিবারক ঔষধ। Arthritis ও Migrain-এর যন্ত্রণায় এই সমস্ত ঔষধ ম্যাজিকের মত তীব্র যন্ত্রণার উপশম করে।

রাসায়নিকেরা আশা করেন যে, বৃক্ষের ত্বক থেকে আরো অনেক নূতন পদার্থের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এঁদের সঙ্গে জীববিজ্ঞানী-রাও (biologists) অনুসন্ধান কার্য চালাচ্ছেন। তাঁদের আশা, যদি এমন কিছু পাওয়া যায় যেগুলি রোগ প্রতিষেধক বা স্বাস্থ্যের পক্ষে উন্নতিসাধক হিসাবে কার্যকরী হবে।

আমরা জানি বেশ কিছু সংখ্যক এন্টিবায়োটিক (Antibiotic) ঔষধ পাওয়া গেছে মাটি (Soil) থেকে এবং এদের মধ্যে বহুপরিচিত স্ট্রেপটোমাইসিন (streptomycine) ও টেট্রোসাইক্লিন (Tetrocycline) জাতীয় ঔষধ কত লক্ষ মানুষের যে রোগমুক্তি ঘটিয়ে জীবন বাঁচিয়েছে, তা বলা শক্ত। এগুলি সবই সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুদের অবদান যেগুলির সন্ধান মানুষ পেয়েছিল মাত্র এক চামচ ছায়াবৃত ভূমির মাটি থেকে। এই প্রসঙ্গে পেনিসিলিনের (Peniciline) কথাও আমরা স্মরণ করতে পারি যা ঐরকম ভূমিতে ছত্রাক জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ থেকে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

॥ অরণ্যের শত্রু ॥

Great trees are long in growing
But they are rooted up in a single hour.
From Latin.

এখনকার দিনে অরণ্যের প্রত্যক্ষ শত্রু অনেক। প্রথমত কুঠার, বুলডোজার (Bulldozer), বৈদ্যুতিক করাত এবং তারপর অগ্নি। এইগুলির কোনো একটি দুটি বা সবগুলি দিয়ে মানুষ অরণ্যকে নির্মূল করছে। সুতরাং পরোক্ষ এবং প্রকৃত শত্রু বলতে মানুষকেই বোঝায়।

হিসাব করে দেখা গেছে ১৯৫০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই ৩৫ বৎসরে পূর্বের অরণ্যের আয়তন অর্ধেকে পরিণত হয়েছে। বছরে ১০ থেকে ২০ মিলিয়ন হেক্টর খোয়া যাচ্ছে। বিশ্ববিখ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী এরিক একহোম আরও পরিষ্কার করে বলেছেন যে, "কিউবা দেশের যতটা আয়তন (আমাদের সিংহলের আয়তনের ১$\frac{৩}{৪}$ গুণ অর্থাৎ প্রায় ৪৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার) এতটা পরিমাণ ভূমি প্রতি বৎসর অরণ্যহীন হয়ে যাচ্ছে।" এই হারে যদি অরণ্য-মেধ চলতে থাকে তাহলে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে শুধু এখানে ওখানে ছড়ানো ছিটানো টুকরো টুকরো অরণ্যের অংশ মাত্র।

আর একটি মার্কিন সরকারের রিপোর্টে বলা হয়েছে—"পৃথিবীর অরণ্য-সম্পদ হারিয়ে আমরা পার্থিব অরণ্য-দারিদ্র্যের দিকে দ্রুতলয়ে এগিয়ে চলেছি।"

একটি শাল-সেগুন-সিডার কি পাইন গাছ বড় হয়ে সারবান হতে



বহু বৎসর সময় লাগে কিন্তু তাকে ধ্বংস করা যায় কয়েক মিনিটে। বনের নিকটবর্তী অঞ্চলে যেসব আদিবাসীদের বসবাস তারা তাদের প্রয়োজনে গাছ কাটতে বাধ্য হয়। একজন বনবিভাগের পদস্থ অফিসার আমায় বলেছিলেন, বনের গাছ বাঁচাতে গেলে অনেক মানুষকে বাঁচানো যায় না, কারণ বনই তাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়।

তাহলে আপনারা কি করে অরণ্যকে রক্ষা করবেন? আমার প্রশ্ন।

উত্তর: আমরা দরিদ্র বনজীবীদের নির্দেশ দিই, তোমরা একটি গাছ কাটলে সেই সময় অন্তত ছুটি গাছের চারা রোপন করবে। এবং এই কাজ তারা প্রায়ই করে থাকে।

এইভাবে ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সৃজনের কাজ যদি চলে তাহলে বনের মারাত্মক ক্ষতি হয় না যদিও বনের অভাব পূরণ করতে ঐ চারা গাছের অনেকদিন, প্রায় ২৫।৩০ বছর সময় লাগে। এখন ইউক্যালিপটাস, ঝাউ প্রভৃতি কতকগুলি গাছ এই কাজে ব্যবহৃত হয় যেগুলি ৫।৬ বৎসরে অনেক বড় হয়ে যায়।

কাঠ মানুষের একটি অপরিহার্য বস্তু হয়েই এটি মূল্যবানদের কোঠায় গিয়ে পড়ে। আজ অনেক কাজ কাঠ বাদ দিয়ে এলুমিনিয়ম কিংবা প্লাস্টিক দিয়ে আমরা ভাবতে পারি কিন্তু চার পাঁচশ বছর আগের কথা ভেবে দেখুন! আমি বলছি ১৫।১৬ শতকের কথা। গো-শকট অশ্ব-শকট তখন পুরানো হয়ে গেছে। মানুষের চোখে ছিল সমুদ্র-বিজয়ের রোমাঞ্চকর স্বপ্ন। নতুন দেশ নতুন দ্বীপ আবিষ্কারের নেশায় সেকালের কয়েকটি দেশের মানুষ তখন উন্মত্ত। তার আগে নানা-প্রকার নৌকার চলন হয়েছে, সেও কাঠের তৈরী। কিন্তু যে অর্ণবযান হাজার হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দেবে তার সর্বাঙ্গ কিসে তৈরি? সেও ত নির্মিত এক প্রকার কঠিন কাঠ দিয়ে। স্পেন ও পর্তুগাল ছুটি দেশ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে যারা বিপুল নৌবহর গড়ে

তোলে। তার সঙ্গে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স্ যে ছিল না তা নয়। এদের আগে ছিল ভাইকিংদের নৌবহর।

আমরা পড়েছি স্প্যানিশ আর্মাডার (Spanish Armada) কথা। কী বিপুল নৌবহর নিয়ে এই সব দেশ মহাসমুদ্রে পাড়ি দিত এবং সেগুলি তৈরী করতে কী বিপুল পরিমাণ কাঠ (hard wood) লাগত ! এ কাঠ আসত কোথা থেকে ? সেও কি পৃথিবীর অরণ্য সম্পদকে উৎখাত করে নয় ? একটি নৌবহর তৈরী করতে হয়ত একটি প্রকাণ্ড অরণ্যকে নির্মূল করতে হয়েছে।

কাঠের চাহিদা মানুষের দিনদিন বেড়েই চলেছে এবং তা পূরণ করতে গিয়ে অরণ্য নিজেকে নিঃস্ব করে ফেলছে।

কোনো কোনো প্রাকৃতিক কারণে বনের মধ্যে আগুন লাগে। সেই দাবানলে বনের গাছপালা পুড়ে ছাই হয়, সঙ্গে সঙ্গে বহু বন্য-প্রাণীও প্রাণ দেয়। এই দাবানল প্রকৃতিসৃষ্ট হয় কচিৎ কিন্তু মানুষই অনেক কারণে এটি সৃষ্টি করে। তবে যে কারণেই হোক, এই অগ্নি নির্বাপিত করা মানুষের সাধ্যের অতীত। এই বৎসরেই ক্যালিফোর্নিয়ার জঙ্গলে যে অগ্নি জ্বলে উঠেছিল সেই অগ্নি নির্বাপিত করতে বহুদিন সময় লেগেছিল।

এখনকার দিনে অরণ্যের পরম শত্রু বলতে অনেকে একবাক্যে বল-বেন কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীরা (Timber-merchants)। পূর্বে এরা এক একটা বনের ইজারা নিয়ে সেখানকার গাছ কেটে ব্যবসা করত। এখন অরণ্যের গাছ সম্বন্ধে নানা বিধিনিষেধ থাকায় তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই তারা চোরাপথে এই কাজে অগ্রসর হয়। সাধারণতঃ তাদের হাতে টাকার অভাব নেই, সঙ্গে লোকজনও থাকে, থাকে ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তারা নিশীথ রাত্রে হানা দেয়। যেখানে শাল-সেগুন প্রভৃতি দামী কাঠের গাছ—যে গাছের একটির মূল্যই ২০/৩০ হাজার কিংবা ৫০/৬০ হাজার টাকা হবে সেই-রকম মূল্যবান গাছ বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে কেটে খণ্ড খণ্ড করে ট্রাক ভর্তি করে উধাও হয়ে যাওয়া মোটেই শক্ত নয়।

হ্যাঁ, নিষিদ্ধ বনে বনরক্ষী থাকে বৈকি। এবং তার হাতেও রাইফ্‌ল থাকে। কিন্তু একজনকে হত্যা করা এমন কি আর কঠিন কাজ! আরো সহজ পথ হল তাকে উৎকোচে বশীভূত করা। অনেক দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাকে তারা সহজে বশ করতে পারে। এবং তাহলে তাদের কাজ আরও সহজ হয়ে যায়। গাছের সম্বন্ধে মূল্যবান অনেক খবরও তারা করায়ত্ত করতে পারে।

মার্কিন দেশে অবশ্য এ কাজটা এত সহজে হয় না। সেখানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্রকে গাছকাটার অনুমতিপত্র জোগাড় করতে হয় এবং এই সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে একবার সরকারের মুখপাত্রের সঙ্গে তাদের তর্ক ও যুক্তি বিনিময় হয়েছিল, তার মর্ম কিছুটা কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল—গণতান্ত্রিক দেশ বলেই এটা সম্ভব। কিছুটা উদ্ধৃতি তুলে দিলাম—

> টিম্বার মার্চেণ্ট বলছেন, বনটা যদি প্রকৃতির সৃষ্টি হয় তাহলে বনের বৃক্ষও প্রাকৃতিক সম্পদ। সেই সম্পদকে কাজে লাগাতে চাই আমরা।
>
> সরকারী মুখপাত্র বললেন, না, প্রাকৃতিক সম্পদ বলেই তাকে ধ্বংস করার অধিকার আপনার থাকতে পারে না।
>
> —কেন পারে না? একটা গাছ বনের মধ্যে অর্থহীন-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, আমরা চাই তাকে মানুষের কাজে লাগাতে। ধরুন একজনের আসবাব হবে, বা একজনের গৃহ হবে—এগুলো কি তাকে সদ্ব্যবহার করা নয়?
>
> —আপনার প্রথম কথাটাতেই আমার আপত্তি। কোনো বৃক্ষই অর্থহীনভাবে দাঁড়িয়ে নেই—এই চিন্তাটাই ভুল। বৃক্ষ যৌথভাবে তার বড় ভূমিকা পালন করছে।
>
> —আপনার কথায় যুক্তি কোথা? সে যে ভূমিকা পালন করছে সেটা পরিবেশ সংক্রান্ত (ecological) তা আমরা জানি কিন্তু তার চেয়েও বড় ভূমিকা মানুষের প্রয়োজন মেটানো। আমরা জানি প্রকৃতি যদি মানুষের হস্তক্ষেপ

না পায়, নিজে নিজে থাকে তাহলে সে অপচয়কারী ও পচনশীল হয়ে ওঠে। তার সেই ক্ষয় বা অপচয় আমরাই পারি রোধ করতে। তাকে মানব-সমাজের নানা কাজে লাগাতে পারি আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা বন সৃজনও করতে পারি।

—আপনার কথা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ আপনারা প্রকৃতির ভারসাম্যের কথা যাই বলুন না কেন, অরণ্য-ক্ষয় রোধ করতে পারেন না বরং অরণ্য ধ্বংস করতে পারেন। উদাহরণ? সকলেই জানেন, যে বনে আপনারা অবাধ অধিকার পেয়েছেন সেই অরণ্যগুলি সবই বিলুপ্ত হয়েছে।

বলা বাহুল্য, একথার উত্তরে টিম্বার ব্যবসায়ীকে নীরব থাকতে হয়েছিল। সত্যই তারা কতকগুলি অরণ্যে গাছ কাটার অনুমতি পেয়ে এমনভাবে বৃক্ষ নির্মূল করেছে যে, সেই বনভূমি রুক্ষ জমিতে পরিণত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এর পর থেকে সকল অরণ্যকেই সরকার সংরক্ষণ বিধির আওতায় এনেছেন।

সকলেই জানেন, অতি মুনাফালোভী মানুষ যদি অর্থবান হয়, সে প্রভূত ক্ষতি সাধন করতে পারে। কথায় বলে, দুষ্টের ছলের অভাব হয় না। আমাদের দেশ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অরণ্যের দামী দামী বৃক্ষ রাতারাতি লুপ্ত হয়ে যায় কি করে? পূর্বে যে আদিবাসীর কথা বলেছি তারা কতটুকু ক্ষতি করতে পারে? তাছাড়া, আমরা জানি ভারতের কোনো কোনো অংশে আদিবাসী এবং বনবাসীরা অরণ্য রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে, এমন কি, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিচ্ছে। তাই, বলা যায়, তারা অরণ্যের বড় শত্রু নয়।

॥ যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু ॥

দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর,
হে নব সভ্যতা।
—রবীন্দ্রনাথ

নাগরিক সভ্যতার বিরুদ্ধে কবির এই তীব্র কটাক্ষের প্রতি আমরা কর্ণপাত করিনি। নব সভ্যতা আরও নূতনতর জঞ্জাল এনে স্তূপীকৃত করছে। সেই জঞ্জাল দিনে দিনে আমাদের পরিবেশকে বিষদুষ্ট করে তুলছে।

যে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আমাদের বাস ও বিচরণ সেই বায়ুকে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস দিয়ে অন্তরস্থ করে নিই। বায়ুর অন্তর্গত অক্সিজেন আমাদের রক্তের জন্য এবং মস্তিষ্কের কোষগুলির জন্য অপরিহার্য।

পৃথিবীর ঠিক উপরিস্থ বায়ুমণ্ডলকে বলে নিম্নাকাশ বা (troposphere)। তার উচ্চতা ১২ কিলোমিটার, তার উপরের স্তরকে বলে মধ্যাকাশ (stratosphere), এর উচ্চতা ৬০ কিলোমিটার। এখানেই আমাদের ভৌগলিক আকাশের সীমানা, তার উর্ধ্বে যে বায়ুহীন অবকাশ তাকে বলে মহাকাশ।

বায়ুমণ্ডল যে শুধু আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজন তা নয় এই বায়ুস্তর ভূ-পৃষ্ঠের তাপকে আটকে রাখে, অতিমাত্রায় ঠাণ্ডা হতে দেয় না। আবার সূর্যের তাপের একটা বৃহৎ অংশকে বাধা দিয়ে আটকে রাখে যার জন্যে আমাদের পৃথিবী অত্যধিক গরমও হতে পারে না।

আমরা দূরের আকাশকে নীল দেখি কেন?

কারণ, বায়ুস্রোতে ভাসমান ধূলিকণা সূর্যালোককে প্রতিফলিত করে এমনভাবে যে আকাশকে দেখায় নীল বর্ণ। বায়ু না থাকলে বা ধূলিকণার অস্তিত্ব না থাকলে আমরা আকাশকে নিকষ কালো বা ঘন অন্ধকার দেখতাম—কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে যেমন অ্যাস্ট্রোনটরা দেখেন মহাকাশকে।

বায়ুস্তর না থাকলে বায়ুর তরঙ্গও থাকত না, শব্দের চলাচল বন্ধ হয়ে যেত। পাখির সুমিষ্ট ডাক যেমন শুনতে পেতাম না তেমনি সেতারের সুরলহরী আমাদের কানে কোন ঝঙ্কার তুলত না। কথা-বার্তা শোনার কোনো উপায় থাকত না। ভ্যাকুয়ামের মধ্যে আমরা দেখছি ইলেকট্রিক বেল বাজছে কিন্তু কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

বায়ুতে কি আছে ?

নিম্নাকাশের বায়ুমণ্ডলের উপাদান হিসাবে আছে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন (এরাই ৯৯ শতাংশ জুড়ে রয়েছে) তাছাড়া আছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, আর্গন, ওজোন, জলীয় বাষ্প এবং ধূলিকণা। পৃথিবীর সমগ্র আকাশের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ১৭,০০,০০০ কোটি টন। ভারতবর্ষে ধূলিকণার পরিমাণ বেশি। এর মধ্যে শহর এলাকায় ধূলোর উপদ্রব আরো বেশি। হাওড়া ও কলকাতা দুটি শহরের বাতাসে ৪৪ শতাংশ দখল করে আছে ধূলিকণা।

এ ছাড়া প্রতিদিন কারখানার ঝুলকালি, মোটর গাড়ির ধোঁয়া, উনুনের ধোঁয়া, বালি, মাটির গুঁড়ো ইত্যাদি কত দূষণক যে বাতাসে মিশছে, যার প্রতিদিনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৬০ টন। এইসব ধূলা-বালির সঙ্গে আছে সিলিকন, কার্বন, ক্যালসিয়াম, সালফার এবং কিছু ধাতুকণাও রয়েছে যেমন, দস্তা, সীসা, তামা, ক্যাডমিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ও পেট্রোলজাত কত কি! এ ছাড়াও আছে পরাগরেণু, উদ্ভিদের স্পোর, ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস ও অ্যাসবেস্টস্ ফাইবার। এগুলির কথা চিন্তা করলে মনে হয় আমাদের বেঁচে থাকাটাই যেন একটা আশ্চর্য ঘটনা।

এই ঘটনা সম্ভব হয়েছে মাত্র একটি কারণে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যে তাপ বিকীরণ হয় তার জন্যই বায়ু চলাচল করতে থাকে। নিম্নাকাশে বায়ু

সদাসর্বদাই চলমান। এই বায়ু দিগ্বিদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। কখনও বা ঊর্ধ্বে উঠছে বা নীচে নামছে। বায়ুর গতি স্থির থেকে কখনও তার গতি ঘণ্টায় ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। তখন সে বিধ্বংসী টর্নাডো বা হারিকেন বা অন্য নামে অভিহিত হয়। এরূপ বেগে বায়ু প্রবাহিত হলে সে মানুষের ঘর বাড়ি ভেঙ্গে দেয়, অনেক কিছু উড়িয়ে নিয়ে যায়। এক মুহূর্তে সে একটি জনপদকে শ্মশান করে দিতে পারে।

বায়ু দূষিত হবার দুটি কারণ দেখা যায়। একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণ। দ্বিতীয়টি হল মনুষ্যকৃত। প্রথমটিকে কমানো বাড়ানো যায় না। সে নির্দিষ্ট নিয়মে হবেই। যথা, আগ্নেয়গিরির বিষাক্ত গ্যাস, মরুভূমির ধূলোবালি, দাবানলের ধোঁয়া ইত্যাদি। কিন্তু কৃত্রিম যে দূষণ যথা, কলকারখানার ঝুলকালি, পরিত্যক্ত গ্যাস, মোটর, পেট্রোল ইঞ্জিনের ধোঁয়া, আধ-পোড়া কার্বন, রেলগাড়ির কয়লার ছাই ও গুঁড়ো ইত্যাদি এ সব দূষণক নিয়মিত দূষিত করে চলেছে বাতাসকে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শহর পরিকল্পনার একটি বড় এবং অপরিহার্য অঙ্গ হল শহরের চতুর্দিকে একটি সবুজ বলয় সৃষ্টি করা। তবেই না শহরের বেষ্টনীস্বরূপ এই বনানীর সবুজ শহরকে দূষণমুক্ত রাখবে। আমরা এ নীতি কখনও অনুসরণ করিনি বরং বারবার লঙ্ঘন করে চলেছি।

মাথাপিছু উদ্বৃত্ত জমি রাখাও শহরের নিয়মে ২৫০ বর্গ ফুট আবশ্যিক। য়ুরোপের শহরগুলিতে এ নিয়ম কঠোরভাবে পালন করা হয়। কিন্তু হায়! আমাদের এই শহরে মাথা পিছু জমি বড় জোর ২০ বর্গ ফুট আছে কি সন্দেহ!

এই শহরের পূর্বাঞ্চলে এককালে বিরাজ করত এক বিস্তীর্ণ জলাশয় এবং দূর সীমান্তে ছিল সবুজ বনানী। এখন আমরা সেই হ্রদকে বিদায় করে সেখানে গড়ে তুলেছি উপনগরী যেটি অসংখ্য মানুষকে বাসস্থান দেবার একটা প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিরাট প্রকল্পের সঙ্গে উপযুক্ত সড়ক তৈরি করার প্রকল্পও দ্রুত রূপায়িত হচ্ছে। বিদায় নিচ্ছে সবুজ পত্রময় বনানীর সৌন্দর্য ও উপকারিতা।

কলকাতার বায়ু কি পরিমাণে দূষিত ?

পরীক্ষা ও হিসাবে দেখা গেছে কলকাতার ধোঁয়া ও গ্যাস প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৩৭০০০ লিটার বাতাসকে দূষিত করছে। এই ধোঁয়া আর গ্যাস কিসের ?

কেন ? পেট্রোল ও ডিজেল চালিত লক্ষ লক্ষ যানবাহন আছে, কারখানার চিমনি আছে, রান্নার চুল্লী আছে আর আছে সঞ্চিত আবর্জনা—পচন-উদ্ভূত দুর্গন্ধ গ্যাস। তা ছাড়া দুটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। তাদের বিচ্ছুরিত গ্যাসও কম নয় যা বাতাসকে দূষিত করছে।

কলকাতা ও প্রান্তবর্তী অঞ্চলে কারখানার সংখ্যা প্রায় ৬০০০ হবে এবং তাদের চিমনির সংখ্যা এর প্রায় ৫ গুণ। রান্নার চুল্লীর সংখ্যা ৪/৫ লক্ষ হবে। তাছাড়া বাস, লরী, টেম্পো, মোটর ইত্যাদির ধূম নির্গমন একত্র করলে কম হবে না। একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ সংস্থা সমীক্ষা করে বলেছে, কলকাতায় প্রতি বর্গ মাইল বাতাসে দৈনিক ৬৭১ মেট্রিক টন দূষিত পদার্থ মিশ্রিত হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিধান দিয়েছেন, বাতাসের প্রতি ১০ লক্ষ ভাগে ৬০ ভাগের বেশি কার্বন মনোক্সাইড (Co) থাকা কোন মতেই উচিত নয়।

কলকাতায় কিন্তু এ নিয়ম অর্থহীন, কেননা, এখানে শ্যামবাজারেই আছে ৭০ ভাগ ঐ বিষাক্ত গ্যাস। ব্রাবোর্ণ রোডে আছে ৬৫ ভাগ। কার্বন মনোক্সাইড বেশি পাওয়া গেছে খিদিরপুরে, মেটিয়াবুরুজে উল্টোডাঙ্গায়, দমদম ও বরানগর অঞ্চলে। এর সঙ্গে ধূলিকণার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে পার্কসার্কাসে, কালীঘাটে, ভবানীপুরে ও গার্ডেনরীচে। এই সমস্ত পরিসংখ্যান দেখলে মনে হয় না কি যে আমরা এক ভয়াবহ বাতাসের সমুদ্রে ডুবে আছি ? যদি প্রশ্ন করেন, আমাদের কোনো ক্ষতি হয়েছে কি ?

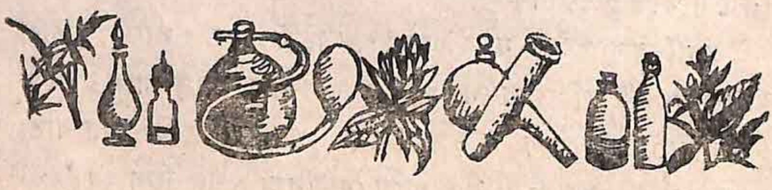
এর হিসাব পাওয়া যাবে কলকাতার চিকিৎসকদের কাছে। তাঁরা বলেন, শ্বাসকষ্ট জনিত রোগের প্রকোপ পূর্বাপেক্ষা বেড়ে গেছে। শিশুদের মধ্যেও এই রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। পৌরসভার হিসাবের খাতা থেকে জানা যায় ১৯৭১-৭৫ সালে মোট মৃত্যু সংখ্যা ছিল ২৫০০০।

তার মধ্যে শ্বাসকষ্ট জনিত রোগে মৃতের সংখ্যা ৪৫০০। পরবর্তী বৎসর থেকে এই সংখ্যা রীতিমত বাড়তির দিকে।

সুতরাং দেখা গেল যে, বায়ুদূষণের ক্ষেত্রে আমাদের রোগ ও মৃত্যু দুই-ই হচ্ছে এবং এই দূষণের জন্যে কে দায়ী যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে বলতে হবে—এর জন্য আমাদের প্রশাসন দায়ী, পৌর কর্তৃপক্ষ দায়ী, প্রতিকার-বিধানে আমাদের অনাগ্রহ দায়ী, আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং সর্বোপরি আমাদের অজ্ঞতাই দায়ী। বহু প্রযত্নে নিজেদের বাঁচাতে গিয়ে আমরা নিজেরাই আর এক সর্বনাশকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

একদিকে বাতাসে অক্সিজেন, একটি পরীক্ষায় জানা গেছে, দশ বছর আগে এই শহরে ছিল ১৯.৯ শতাংশ। কিছুদিন আগে এই হার কমে ১৭.৫ শতাংশ হয়েছে। বর্তমানে আমাদের অনুমান এই পরিমাণ আরো কমতির দিকে। অন্যদিকে দেখুন, প্রতি ঘণ্টায় আমরা ৩৫০০০ লিটার বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে মিশিয়ে তাকে দূষিত হতে দিচ্ছি। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারে খুবই চিন্তিত। কিছুদিন আগের এক সমীক্ষায় তাঁরা নানা ভয়াবহ তথ্য সংগ্রহ করেন। প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা এখনও তেমনভাবে গ্রহণ করা হয়নি। শুধুমাত্র সরকারী পর্যায়ে যে কাজটা করা হয় তা হল ধুমধাম করে কয়েক শত করে বৃক্ষচারা রোপন করা। সেটার সঙ্গে একটা উৎসবের আবহাওয়া সৃষ্টি করা কিন্তু ঐ চারাগুলিকে বৃক্ষে পরিণত হবার দিকে যত্ন নেবারও প্রয়োজন মনে করি না।

সরকারের যা উচিত ছিল তা হচ্ছে জনসাধারণের অজ্ঞতা দূর করা এবং তাদের আগ্রহ বর্ধিত করতে নানাভাবে প্রচারকার্য চালানো।

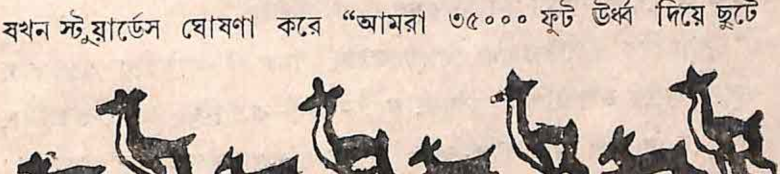


॥ আমাদের পরিবেশ ॥

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণতরু, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র পুষ্পফল গন্ধরেণু।
—রবীন্দ্রনাথ

এই পৃথিবী সত্যই বড় সুন্দর। পৃথিবীর মানুষের কাছে তার জীবন সুখের হোক দুঃখের হোক তবু পৃথিবী প্রিয়। পৃথিবী ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়, তার শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও বসন্ত ছটি ঋতুর ডালি সাজিয়ে আমাদের মনোহরণ ক'রে জাগায় আমাদের মনে কত আশা, আমাদের প্রাণে কত আনন্দ।

আমরা কি বুঝতে পারি যে, পৃথিবী নামক আমাদের এই গ্রহটি প্রচণ্ড বেগে তার দুই গতি নিয়ে ঘূর্ণায়মান? আমরা কি বুঝতে পারি সে প্রতি সেকেণ্ডে সাড়ে আঠারো মাইল বেগে ছুটছে সূর্য প্রদক্ষিণ কক্ষ-পথে? আমরা যখন বিমানে চড়ে কোথাও যাই, বিমানের মধ্যে কি আরামেই না থাকি! তৃষ্ণা পেলে পানীয় আসছে, ক্ষুধার সময় আসছে আহার্য, ক্লান্তিতে আছে বিশ্রাম ও নিদ্রা। তখনই জানতে পারি যখন স্টুয়ার্ডেস ঘোষণা করে "আমরা ৩৫০০০ ফুট উর্ধ্ব দিয়ে ছুটে



চলেছি ঘণ্টায় ১০০০ মাইল বেগে···।” পৃথিবীও তাই নয় কি? আরও হাজার লক্ষগুণ বিস্ময় রয়েছে তার মধ্যে। আমরা পৃথিবীর গতির কোনো আভাসও টের পাই না, নিশ্চিন্ত মনে ঘরবাড়ী করে স্থায়ীভাবে বাস করি এবং আমদের জীবনযাত্রা চলে বংশপরম্পরায়।

আর একটি চরম বিস্ময়ের কথা এবং পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, মহাকাশে অগণ্য গ্রহতারকার মধ্যে আজ পর্যন্ত যা জানা গেছে পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও কোনো জীবনের চিহ্ন নেই। কোটি কোটি তারকা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ কিন্তু গ্রহগুলিকে ত ভাল করে চিনি। এতগুলি গ্রহের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মধ্যে জীবন-রূপ আশ্চর্য সুন্দর জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, পৃথিবীতেই একমাত্র জল নামক বস্তুটি আছে। অন্য কোথাও হয়ত গ্যাসীয় অবস্থায় কিম্বা কোথাও জমাট বরফ অবস্থায় আছে এটি। চাঁদে বায়ুমণ্ডল আছে কিন্তু জল নেই। বুধে তাও নেই। মঙ্গলে নাকি খুব সামান্য জলের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে কিন্তু জীবনের চিহ্ন নেই। যতদূর জানা গেছে শনি, ইউরেনাস, নেপচুন সবার অবস্থাও তাই। কোথাও জলের চিহ্ন নেই।

পৃথিবী যেন সৃষ্টিছাড়া। এ যেন অনন্য একটিমাত্র গ্রহ যেখানে অপর্যাপ্ত জল তার সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাতাস, তাই উদ্ভিদের প্রাচুর্য, জীবনেরও প্রাচুর্য। এখানে উদ্ভিদ ও জীব বাস করছে মাটি, জল ও বাতাসের সঙ্গে। এইগুলির সমন্বয়েই তো জীবন। জীবনের আশেপাশে যা তাই তার পরিবেশ। জীবন ও তার পরিবেশ সর্বদা একে অপরের সাহায্য ছাড়া অচল।

পৃথিবীর উপরিভাগে দিগন্তজোড়া সমুদ্র। পৃথিবীর ৭১ ভাগ জুড়ে আছে জলরাশি। সমুদ্র, হ্রদ, নদনদী কত কি। এক-চতুর্থাংশ যে ভূমি তাও পাহাড় পর্বত, দুর্গম অরণ্য ও দুস্তর মরুভূমিতে সমাচ্ছন্ন। সুতরাং পৃথিবীতে মানুষের জন্য কতটুকু ভূমিই বা অবশিষ্ট থাকে। তবু তাই পেয়েই মানুষ ধন্য।

মানুষের চারিপাশে প্রাকৃতিক ও ভৌত রাসায়নিক পরিবেশের প্রতিটি অঙ্গের সঙ্গে পরস্পরের আত্মীয়তার সম্পর্ক। তার সঙ্গে আবার আছে আর একটি জগৎ, মনুষ্যেতর প্রাণীর বিরাট জগৎ। এটি আমাদের জীবনযাপনের পরম সহায়ক—এই সমস্তগুলির সমন্বয়ে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকেই 'পরিবেশ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আজ নয় বহুদিন আগে গ্রীক দার্শনিক হিপোক্রিটাস ও অ্যারিস্টটল প্রভৃতি মনীষীগণ এই পরিবেশ সম্বন্ধে যে চিন্তা করে গেছেন তার প্রমাণ আছে। খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দে থিয়োফাস্টাস উদ্ভিদ জগতের পরিবেশ নিয়ে রীতিমত গবেষণা করেছিলেন। তার অনেক পরে ১৭৫৬ সালে এলেন বুঁফো (Buffon)। তাঁর Natural History বইটিতে মানুষ, পশু, পাখী ও গাছপালার মধ্যে পরিবেশ পদ্ধতিগত যে একটা নিকট সম্পর্ক আছে তা প্রমাণ করেছেন। তাঁর আর একটি চিন্তা ছিল জনবৃদ্ধি সংখ্যা নিয়ে। সেই সূত্রটি ধরলেন তাঁরই উত্তরসূরী বিশ্ববিখ্যাত ম্যালথাস (Malthus) যিনি অকাট্য যুক্তি দিয়ে দেখালেন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির হার জ্যামিতিক বা গুণোত্তর প্রগতিতে (geometric progression) চলে কিন্তু তাদের আহার্য বা শস্য ফলন চলে সমান্তর প্রগতিতে (Arithmetic progression)। এই পার্থক্যের ফলে এমন এক সময় ভবিষ্যতে আসবে যখন মানুষের সংখ্যা এমন অতিমাত্রায় বাড়বে যে খাদ্যাভাবে তাদের দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে হবে।

তারও পরে জীববিজ্ঞান আরও সমৃদ্ধ হল ডারউইনের আবির্ভাবে। তাঁর বিবর্তনবাদ চিন্তাজগতে এক যুগান্তর আনল। আর্নেষ্ট হেকেল (Ernest Heckel) প্রথম কিন্তু 'ইকোলজি' শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি পর্ষদের তরফ থেকে কাজ শুরু করলেন মরু ও খরা অঞ্চলের পরিবেশ নিয়ে। তারপর প্রায় সব দেশেই ইকোলজির পঠনপাঠন শুরু হয়ে যায়। ১৯৪০ সালের পর থেকে ইকোলজি একটি বিজ্ঞান হিসাবে পুরোদস্তুর স্বীকৃতিলাভ করে। তারও পরে ১৯৭২ সালে স্টকহোমে এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স বসল পরিবেশ সংক্রান্ত সর্বদেশীয় সমস্যা ও

পরিস্থিতির আলোচনা এবং তার কার্যকর প্রতিকার করা সম্ভব কিনা এবং কিভাবে সম্ভব তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য।

জীবনের অস্তিত্ব কিসে?

জীবকোষে বস্তু ও শক্তির ঠিকমত জোগান হলেই জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা পাবে। এই জোগান দেয় কারা? দিচ্ছে জল, মাটি, খাদ্য, বায়ু ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে কোনটি যদি হঠাৎ বিষিয়ে ওঠে কিম্বা যদি ভৌত পরিবেশ বদলে যায় অথবা যদি বাতাসে বেড়ে ওঠে উত্তাপ বা তীব্র শব্দতরঙ্গ, অথবা মাটি যদি হারায় তার উর্বরা শক্তি, অথবা জল যদি কোন কারণে হয় কলুষিত বা তেজস্ক্রিয়—তাহলে জীব জগতে দেখা দেবে তার বিষময় ফল। ধ্বংস হবে গাছগাছালি। সেই সঙ্গে ধ্বংস হবে মানুষ। এই জীবনের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার কারণগুলির নাম দেওয়া হল পরিবেশ দূষণ।

আমরা জানি গাছের সবুজ অংশে সূর্যালোক সম্পাতে যে সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া চলতে থাকে তার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট হয়ে হাওয়ায় মিশে যায়। এই অক্সিজেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমরা ফুসফুসে টেনে নিই, বাড়ে আমাদের জীবনীশক্তি। সেই উদ্ভিদও সেই সঙ্গে পাচ্ছে নাইট্রোজেন আর কার্বন ডাই-অক্সাইড যা উদ্ভিদকে বাঁচিয়ে রাখছে ও তার পুষ্টি সাধন করছে। একটি অপরের পরিপূরক হিসাবে এই যে অবিরাম কাজ হয়ে চলেছে একেই বলা যেতে পারে পরিবেশ-চক্র।

এখন এই পরিবেশ সংক্রান্ত তিনটি যে প্রধান বস্তু আছে তাই হবে আমাদের পৃথক আলোচনার বিষয়। প্রথম মাটি, দ্বিতীয় জল, তৃতীয় বায়ু।

॥ মাটি বা ভূমি ॥

এই পৃথিবীর মাটি যাকে আমরা তুচ্ছতার একটি প্রতীক বলে গণ্য করি সে মোটেই তা নয়। তার উপরিভাগের এক সেন্টিমিটার পুরু আবরণ তৈরি হতে সময় লাগে প্রায় ১০০ বছর, কিন্তু বর্ষার জলস্রোতে

সেই অনাবৃত মাটি ধুয়ে যেতে পারে তিন দিনে বা চার দিনে। সেই মাটি আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। কেমন করে তাই বলছি, নদীর স্রোতে মিশে সেই মাটি চলতে চলতে নদীতে পলি পড়তে থাকে এবং নদীর নাব্যতা কমে যায়। অগভীর নদী যখন জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন সে তার দুদিকের কিনারাকে ভাসিয়ে দেয়। এই-ভাবেই সে বিধ্বংসী বন্যার সৃষ্টি করে।

মূল্যবান বৃক্ষরাজিকে আমরা কি ভাবে নষ্ট করি তার একটা নমুনা দেওয়া যেতে পারে। আমরা তাকে কেটে কেটে পুড়িয়ে ফেলি। পরিমাণটা সামান্য নয়। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের দেওয়া একটি তথ্য থেকে পাওয়া যায় যে, সরকারের অনুমতি নিয়ে যে কাঠ কাটা হয় তার পরিমাণ ২০ লক্ষ টন, কিন্তু বিনা অনুমতিতে বেআইনীভাবে যা কাটা হয় তার পরিমাণ ১ কোটি টনেরও বেশী। ভারতে জ্বালানী কাঠ খরচ হয় ১'২২ কোটি টন। অথচ জ্বালানীর বিকল্প আমরা নিশ্চয়ই ব্যবহার করতে পারি। এ ছাড়া কাঠের অন্য ব্যবহারও যে প্রচুর তার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। বনভূমি নিশ্চিহ্ন হওয়ার একটি কুফল যা এখানে প্রসঙ্গত এসে পড়ে তা হল বনভূমির অভাবে ভূমিক্ষয় রোধ করা যে প্রায় অসম্ভব এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

মানুষের এত অত্যাচার সত্ত্বেও পৃথিবী অপূর্ব সুন্দর, পুষ্পে তৃণে সবুজ বনানীতে রমনীয় এর স্থলভাগ, আর দিগন্তবিহীন সুনীল সমুদ্র ফেনিল তরঙ্গ ভঙ্গে খেলা করছে। এর সঙ্গে নিত্য প্রবহমান বাতাস —এই আমাদের পৃথিবী। এ যেন আমার আপনার সবার পরম প্রিয় স্থান।

ঐখানে ঐ যে প্রকাণ্ড মহীরুহ ঋজু হয়ে মাটির উপর দণ্ডায়মান, উপরে তার শত সহস্র শাখাপ্রশাখা আকাশের দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে ছত্রাকারে যেন একটি মহান ভাস্কর্য—তার পত্র সবুজ রৌদ্রস্নাত হয়ে সালোক-সংশ্লেষে আমাদের যে পরিমাণ অক্সিজেন দান করছে সে পরিমাণ প্রাণবায়ু অন্ততঃ ৩০০০ চারা গাছপালা ছাড়া আর কেউ দিতে পারত না।

অরণ্য প্রদেশে মাটির উপর অবিশ্রাম ঝরে পড়ছে বৃক্ষের পত্র পল্লব পুষ্পদল। সেগুলি কিন্তু আবর্জনা হয়ে উঠছে না। মাটি সেগুলিকে আত্মসাৎ করে নিচ্ছে সার রূপে তার অসংখ্য জীবাণুর সাহায্যে। সেই সার অন্য গাছকে পুষ্ট করছে। শুধু তাই নয়, মহীরুহের আরও অবদান হল সে নীচের মাটিকে প্রবল বর্ষণের তোড় থেকে রক্ষা করছে। এইভাবে প্রকৃতির বিধানে মাটি আমাদের জীবনধারণের যে কত বড় অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে আছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আমাদের প্রাণধারণের আসল রসদ সেই ত দান করছে দানাশষ্য ও ফলমূল রূপে, তাই নয় কি?

।। জল ।।

মাটির মতই জল এমন একটি জিনিস যা না হলে আমাদের এক মুহূর্তও চলে না। প্রকৃতি তাই বুঝি আমাদের চতুর্দিকে জল দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন। মাটি বা ডাঙ্গা যদি দেন ২৯ ভাগ, জল দিয়েছেন ৭১ শতাংশ।

জলের প্রসঙ্গে সমুদ্র মহাসমুদ্রের কথাই মনে আসে। প্রশ্ন জাগে, কত গভীর হয় মহাসমুদ্র?

সব সমুদ্রেরই গভীরতা মাপা হয়েছে, তবে একটু অন্যভাবে বললে হয়ত ব্যাপারটা সহজবোধ্য হবে। আমরা হিমালয়কে চিনি, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেষ্টকেও জানি। আচ্ছা, যদি মাউন্ট এভারেষ্টকে সমুদ্রের গভীরতম অংশে নামিয়ে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে এভারেষ্ট চূড়ো ডুবে গেছে এবং তার মাথার উপর দু'কিলোমিটার জল। এ থেকে আন্দাজ করা যায় পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতের উচ্চতার চেয়েও মহাসমুদ্রের তলদেশ বেশি গভীর।

এবারে একটা প্রশ্ন স্বভাবত মনে জাগে তা হল এই স-সাগরা পৃথিবী তার সঙ্গে অসংখ্য নদনদী হ্রদ সবই জলে পরিপূর্ণ—এত জল কোথা থেকে এল? অসীম শূন্যে ঘূর্ণায়মান পৃথিবী যে এক কালে

প্রচণ্ড উত্তাপে গলিত পিণ্ডবৎ গোলাকার রূপ ধারণ করেছিল, সে এত জল পেল কোথা থেকে ?

এ প্রশ্ন বহুদিন মানুষের মনকে দোলা দিয়েছে। কেউ বলবেন মেঘের বৃষ্টি দিয়ে সব জলে পরিপূর্ণ হয়েছে। তাহলে কিন্তু আবার প্রশ্ন আসে, মেঘ এল কেমন করে এবং মেঘে এত জলই বা কোথা থেকে এল ? সমুদ্র থেকে মেঘের সৃষ্টি বললে আবার সেই প্রথম প্রশ্নে ফিরে আসতে হয় না কি ?

এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন এবং এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। তার জন্যে কিন্তু আমাদের পেছিয়ে যেতে হবে ছ'শো কোটি বছর আগের যুগে। তখনকার শিশু পৃথিবী, একটি জ্বলন্ত গলিত পিণ্ডবৎ গোলাকার এক বস্তু, দুরন্ত বেগে মহাশূন্যে ধাবমান—সূর্যের প্রচণ্ড অভিকর্ষে তার চতুর্দিকে সে ঘূর্ণায়মান। তারপর ধীরে ধীরে সে কিঞ্চিৎ শীতল হল। গলিত ধাতব বস্তুর তরল গুরুভার কেন্দ্রস্থ হল এবং ক্রমে ক্রমে ভূত্বক ঠাণ্ডা হতে লাগল।

পৃথিবীকে আমরা যেমন দেখছি, মাঝে মাঝে কোথাও একটু আধটু ভূকম্পন বা আগ্নেয়স্রাব—এই মাত্র। তাহলেও একে কি এখন শান্তশিষ্ট বলা চলে ? কিন্তু মোটেই তা নয় এবং আগেও ছিল না। জন্মের পর থেকে সে যে কতবার ভাঙাগড়ার খেলা খেলেছে তা শুধু বিধাতাই জানেন। কতবার সে তার অন্তরস্থ অগ্নিদাহকে দুর্দাম বেগে উদ্গীরিত করেছে। কতবার সে তার ভূত্বকের তাপাঙ্ক নামিয়ে সারা দেহকে হিমশীতল বরফে সমাচ্ছন্ন করেছে তার কিছু কিছু হিসাব মাত্র বিজ্ঞানীরাই রাখেন।

সে আজ থেকে কয়েক কোটি বছর আগে একবার এই ধরিত্রী তার দেহকে বিদীর্ণ করে কি জানি কোন বিপুল অন্তর্দাহের মর্মন্তুদ আক্ষেপে নিজেকে ফাটিয়ে চৌচির করে ফেলে। সেই সময় সেই জ্বালাময়ী ফাটল দিলে বেরিয়ে পড়ে পুঞ্জ পুঞ্জ গ্যাস। অন্তরস্থ গলিত ধাতু ও আকরিক রাশিও গ্যাসের আকারে বেরিয়ে পড়ে মহাশূন্যে। তার সঙ্গে ছিল জলীয় বাষ্প। এই জল ছিল ধরিত্রীর জঠরে পাথরের

শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ। প্রবল তাপ, যথা ২৩০° সেলসিয়াসে সেই পাথর মাইকা, বেসাল্ট প্রভৃতি বিচূর্ণিত হয়ে নির্গত হতে থাকে জলীয় বাষ্প। গলিত উত্তপ্ত কালো পাথরের সঙ্গে প্রবলবেগে উদ্গীর্ণ হতে লাগল প্রচুর, পরিমাণে বিভিন্ন গ্যাস। এই গ্যাসগুলি জমে পৃথিবীর উপরে সৃষ্টি করল বায়ুমণ্ডল। ঐ গ্যাস মিশ্রণে ছিল কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ও হাইড্রোজেন আর ছিল বাষ্পীভূত জলরাশি, আরও কত অন্যান্য গ্যাস। পৃথিবীর তখন বলা হয় শৈশব অবস্থা। তাই সে নিত্য অস্থির নিত্য, চঞ্চল। সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডল নিয়ে তার খেলার শেষ নেই।

বিজ্ঞানীরা বলছেন ঐ অভূতপূর্ব্ব গ্যাসের সংমিশ্রনে ছিল না শুধু ওজোন (Ozone) স্তর। জীবজগৎ তখন ছিলই না, তাই সূর্যের অতিবেগুনী (Utra Violet) রশ্মিগুলি জীবজগৎকে ধ্বংস করতে পারেনি। কিন্তু ঐ অতিবেগুনী রশ্মি একটি মহৎ কাজ করেছিল সেদিন। তা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে মিশ্রিত জলকণাগুলিকে সালোক-বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় বিভাজিত করল হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনে। হাইড্রোজেন তার অতি হাল্কা ওজনের গুণে পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে চলে গেল, থেকে গেল অক্সিজেন বাতাসের অমূল্য উপাদান হিসাবে —আজও যা রয়ে গেছে।

পরবর্তী যুগ এল, এখন থেকে ২৮০ কোটি বছর আগে। তখন পৃথিবীর বুঝি মেজাজ প্রসন্ন। সৃষ্টি কর্মে তার মন। তাই দেখা গেল জলজ উদ্ভিদ। উদ্ভিদের সবুজ সূর্যরশ্মিকে নিয়ে সে তার তুর্মূল্য খেলায় মত্ত হল, সেই সালোক-সংশ্লেষের খেলা। এই খেলা আজও চলছে, পত্রের সবুজে সবুজে আর প্রাণধারী জীবজগৎ বুক ভরে দিচ্ছে প্রাণবায়ু।

কোটি কোটি বছরের পৃথিবীর অপার্থিব ঐতিহাসিক ঘটনা ছেড়ে এবার আমরা আমাদের কাছের জগতে একবার দৃষ্টিপাত করি।

দেখছি যেন নাটকীয় ট্র্যাজিডির সংকেত। আমরা যত সভ্য হচ্ছি ততই আমরা সংখ্যায় বাড়ছি। বাড়ছে আমাদের সহস্র প্রয়োজন। গড়তে হচ্ছে শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং তার ফলে তুষিত করছি

জলকে ও বাতাসকে। যেখানে অনেক লোক একত্রে বাস করে ঠেসাঠেসি করে তাকেই আমরা নগর বা শহর বলি। যেখানে বহু-লোককে, যেমন কলকাতা শহরে যেখানে প্রায় ৮০ লক্ষ লোক বাস করে, সেখানে কেমন করে জলের জোগান দেওয়া হয়? এটি একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন।

অনেকেই জানেন, নদী কিম্বা কোন হ্রদ থেকে এই বিপুল পরিমাণ জল নেওয়া হয়। সেই জলকে শোধণ করে তোলা হয় ওভার হেড ট্যাঙ্কে। সেখান থেকে পাইপের সাহায্যে সারা শহর পরিব্যাপ্ত করে মাটির নীচ দিয়ে প্রতি বাড়িতে বাড়িতে জলের জোগান দেওয়া হয়। এই জলকে filtered water বলে। এই জল দিয়ে পান, স্নান, রান্না ইত্যাদি সব কাজই করা যেতে পারে।

কিন্তু শহরের ময়লা ধোওয়া অপরিচ্ছন্ন যে জল অর্থাৎ স্নানের পর, রান্না, ধোওয়া ধুয়ির পর, কাপড় কাচার পর, কিম্বা মলমূত্র ও ড্রেন দিয়ে প্রবাহিত যে ময়লা জল তাকে নিয়ে কি করা হয়?

সেই ময়লা জলকে বলা হয় সিউয়েজ (sewage)। এই সমস্ত সিউয়েজের জল নিয়ে সব শহরের একটি বড় সমস্যা। এ জল পানীয় filtered জলের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়া যে বিপজ্জনক তা সহজেই অনুমেয়।

এই সিউয়েজের জল পরিশ্রুত করার অনেক পদ্ধতি আছে। প্রধানত এই জলকে নিয়ে যাওয়া হয় শহর থেকে দূরে কোন বিশাল জলাধারে। এখানে পর পর তিনটি জলাধার থাকে। প্রথমটিতে কিছুদিন থাকার পর দ্বিতীয়টিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কিছুদিন থিতানোর পর তৃতীয় জলাধারে নেওয়া হয়। ক্রমে ক্রমে ঐ জলের ময়লা ও দূষণ কমতে থাকে, এবং তৃতীয় ট্যাঙ্কের জল অনেক পরিষ্কার।

ট্যাংকের নীচে থিতানো তলানি রূপ কঠিন পদার্থটি আর একটি জলাধারে (digestion tank) নেওয়া হয়। তখন তার আরও

রূপান্তর ঘটানো হয়। তারপর তাকে কৃষিক্ষেত্রে পাঠানো হয় তরল উৎকৃষ্ট সার হিসাবে।

কলকাতা পৌর অঞ্চলের তরল জৈব সার ধাপার মাঠে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। আবার ঐ তরল সার মাছের এক উৎকৃষ্ট খাদ্য। সেটি তখন বিস্তীর্ণ ভেড়ীর জলে বা জলাভূমিতে মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। একদিকে যেমন ময়লা নিষ্কাশন অন্যদিকে তেমনি ফসল উৎপাদন ও মাছের পুষ্টিসাধন। দুটি কাজই চলতে থাকে। এক সঙ্গে চলছে দুই প্রয়োজনীয় কাজ। কিন্তু সুপরিকল্পিত উপায়ে সুষ্ঠুভাবে কাজটি না হলেই বিপদ।

অনেক ছোট ছোট শহর আছে যেখানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা কল-কারখানা আছে কিন্তু প্রত্যেকটি কারখানায় sewage পরিশোধনের ব্যবস্থা নেই। তখন তারা ঐ ময়লাপূর্ণ জলরাশি নদীর জলে ফেলে দেয়। ফলে কি হয়?

নদীর কিছু পরিমাণ জল দূষিত হতে থাকে। সেখানে দূষণক হিসাবে অনেক কিছু থাকতে পারে। যথা, আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, ক্রিমিয়াম, ফেনল, সায়ানাইড ও পেট্রোল জাত নানাবিধ রাসায়নিক। প্রতিটি বস্তু জীবদেহে বিষক্রিয়া করে। নদীর জলে এইগুলি পড়াতে নদীতে যে মাছ থাকে তাদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। সেই মাছ জালে উঠে বাজারে বিক্রী হয় এবং নাগরিকদের দেহে খাদ্য হিসাবে প্রবেশ করে। নদীর নাব্যতা যত কম হবে ততই দূষণ ক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপযুক্ত সাবধানতা না নিলে দূষণ ক্রিয়া জলের মাধ্যমে আমাদের দেহে প্রবিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর ফল মারাত্মক হতে পারে যদি না আমরা অত্যন্ত সতর্ক হয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মোকাবিলা না করি। সম্প্রতি সংবাদপত্রের একটি প্রতিবেদকে দেখা যাচ্ছে শহরের নানা স্থানে গভীর নলকূপের জলও জীবাণুমুক্ত নয়। নিঃসন্দেহে এটি চিন্তার বিষয়। কলকাতা পুরসভার গভীর নলকূপের

পানীয় জল জীবাণুমুক্ত নয়। রাজ্য সরকার নিযুক্ত এক সমীক্ষক দল কিছুদিন আগে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় ২২টি গভীর নলকূপের পানীয় জল পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার পর দেখা যায়, এই ২২টি গভীর নলকূলের জলের মধ্যে ৪টি ছাড়া অন্য ১৮টিরই জল জীবাণুমুক্ত নয়।

॥ বাতাস ॥

এবার আমরা বায়ুদূষণ প্রসঙ্গে আসছি। বাতাস আমাদের পরিবেশের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। প্রকৃতি আমাদের জন্যে যে ব্যবস্থা করেছেন তাতে দূষণের প্রশ্নই ছিল না। বায়ু ছিল নির্মল, আমরাই তাকে বিষাক্ত করেছি। অন্য একটি পরিচ্ছেদে এসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছি। তবু বলছি, আমরা আমাদের অজ্ঞতায় প্রয়োজনের তাগিদে এবং অতিরিক্ত লোভের দুষ্কর্মের দ্বারা আমরা বায়ুকে যথেষ্ট দূষিত করেছি এবং করছি। পেট্রোল-চালিত যান-বাহনের সংখ্যা যদি ক্রমেই বাড়তে থাকে (অতীতের রেকর্ড থেকে তাই ধরা যেতে পারে) তাহলে বাতাসে কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোকার্বন ও অন্যান্য বিষবাষ্প হতে নিস্কৃতি পাবার আশা দুরাশা ছাড়া আর কি হতে পারে ?

চীনদেশের মানুষ অনেক সচেতন। ওরা অটোমবিলের সংখ্যা কমিয়েছে। বেইজিংয়ে ওরা যানবাহন হিসাবে ব্যবহার করে বাই-সাইকেল। মেয়ে পুরুষ সবাই চড়ে যাচ্ছে। কান-ফাটানো হর্নের আওয়াজ ওখানে শুনতে পাওয়া যায় না কিম্বা কর্কশ যন্ত্রের আওয়াজও বাদ দিয়েছে ওরা। রাস্তায় থুথু ফেললে ২৫০ টাকা জরিমানা দিতে হয়। কোনো ব্যবহৃত জিনিসের খালি ঠোঙ্গা বা খেয়ে-ফেলা আইসক্রীম খালি ক্যাপ রাস্তায় যেখানে সেখানে ছড়ানো চলবে না। সেটাও অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। আমরা এখানে ওরকম আইন করলে হয়ত প্রতিবাদের ঝড় উঠবে। দাঙ্গাও বেঁধে যেতে পারে। কিন্তু ওরা মনে হয় নিজেদের স্বাস্থ্য ও প্রতিবেশীর কল্যাণ সম্বন্ধে বেশি সচেতন।

মস্কো শহরে মোটর গাড়ির জন্য নাকি পেট্রল ব্যবহার করা হয় একটু অন্যভাবে। আমরা যে Cylinder (L.P.G.) রান্নার জন্য ব্যবহার করি তাই ব্যবহৃত হয় ওদের গাড়িতে। ঐ গ্যাসের ধোঁয়া বা বিষাক্ত কোনো ক্ষতিকর পদার্থ নেই। তাছাড়া। একটি Cylinder-এ গাড়ি চলে ১৫৬ মাইল।

তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের কথা বলব, ল্যাটিন আমেরিকা। এখানে ব্রাজিল একটি বিশাল দেশ, ভারতবর্ষের পাঁচগুণ হবে আয়তনে। ওখানে শহরে শহরে মোটর গাড়ির সংখ্যা রোগীর বা মার্কিন দেশের শহরের তুলনায় অনেক বেশী। ওখানে বাতাস দূষণ সম্বন্ধে ওরা এত সচেতন যে গাড়ি চালায় ঠিকই কিন্তু পেট্রোল দিয়ে নয়। ওরা ব্যবহার করে মিথানল (Mithanol) নামে এক প্রকার অ্যালকোহল। এইটি নিজের দেশেই তৈরী করে। জাতীয় ইণ্ডাষ্ট্রি হিসাবে সেটাও গর্বের বিষয়। মিথানলের ধোঁয়ায় কোনো দূষণক নেই।

মার্কিন দেশে অবশ্য অনেকগুলি সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে যেমন exhaust pipe-এ filter ঢাকনি লাগানো, তা ছাড়া পেট্রোলের unleaded (শীশাহীন) গুণের জন্য বাতাস দূষণ হয় না। সাধারণ পেট্রোল থেকে তার মূল্য লিটার প্রতি ১০ সেণ্ট বেশি মাত্র। বায়ু দূষণ নিবারণের অধিকর্তা ডঃ সুনীল ব্যানার্জির কাছে একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে। আমি ডঃ দুর্গা বসুর লেখার উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি :

"কলকাতায় ব্রাবোর্ন রোডে রাত ৮ টার সময় ২৫০০ গাড়ি চলাচল করে। অর্থাৎ মিনিটে যদি ৪২টি গাড়ি ঐ রাস্তায় চলে তাহলে জ্যাম হবেই। এর ফলে বাতাসে সীসা ও সালফারের পরিমাণ বাড়ছে এমন হারে যে রাস্তাটি ধোঁয়ার চাদরে আবৃত হয়ে পড়ছে···

এই হারে কার্বন মনোক্সাইডে বৃদ্ধির পরিমাণ রক্তের লোহিতকণার অবধারিত মৃত্যু। ফল অ্যানিমিয়া রোগের আধিক্য। সীসার পরিমাণ বৃদ্ধিতে বাড়ছে মাড়ির রোগ অস্থিবন্ধনীর বেদনা আর spondilitis।



ইগ্রেট পাখি (একপ্রকার বক) পালকে সজ্জিত হচ্ছে (রায়গঞ্জ)



আর্দ্র মিশ্রিত অরণ্য (মোরঘাট, ডুয়ার্স)

সালফার থেকে আসছে হাঁপানী, স্নায়ুবৈকল্য ও খিটখিটে মেজাজ। ধূলিকণা থেকে হৃদরোগ। হাইড্রোকার্বন থেকে ক্যান্সার ও অ্যাজমা। জ্যামের সময়সীমা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী সাধারণের দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হয়ে আসছে…”

জ্যামের সময় সবচেয়ে মারাত্মক হল মানুষকে গাড়ির মধ্যে অসহায় বন্দী অবস্থায় দরজা জানালা প্রায় বন্ধ করে বসে থাকতে হয়। হাঁটা চলারও উপায় নেই। অথচ পাঁচশ গাড়ির সমস্ত ইঞ্জিনগুলি চালু অবস্থায় থাকবে—তার ফলে বিষাক্ত বায়ু বাতাসের সঙ্গে ফুসফুসে টেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। সবচেয়ে বড় কথা কতক্ষণ জ্যাম চলবে কেউ জানে না। নিউইয়র্কের মত শহরে দেখেছি, জ্যাম হয় কখনো সখনো। কিন্তু বড় জোর ৩/৪ মিনিটের মধ্যে পরিস্কার। আর আমাদের শহরে আমাদের জানা আছে, কয়েকবার আধঘণ্টা থেকে ৪৫ মিনিট মৃত্যু পথযাত্রী হয়ে একভাবে বসেথাকতে হয় বন্দীর মত।

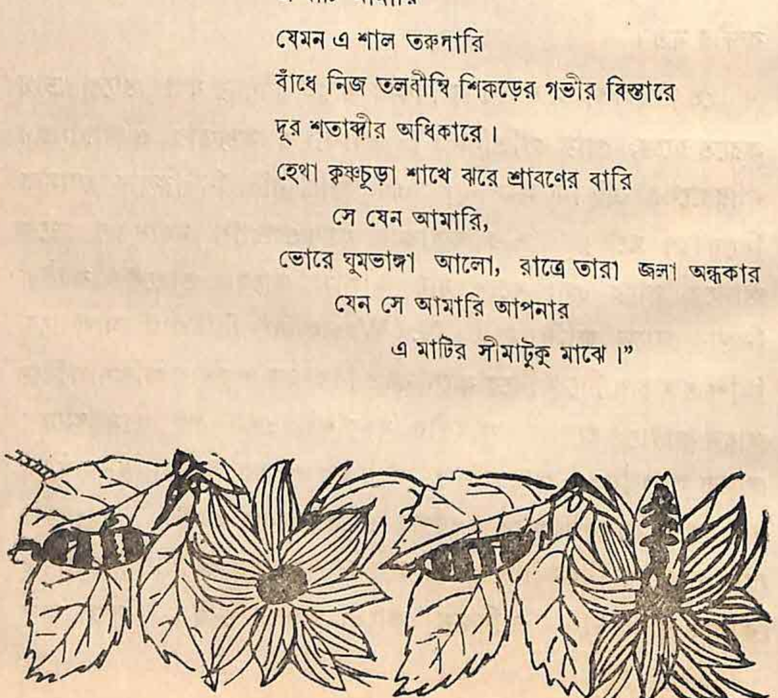
যে বিষবাষ্প মানুষের আবিষ্কার তারই বিষময় ফল তাকে ভোগ করতে হচ্ছে, প্রায় প্রতিদিন। তথাকথিত সভ্যতার ও আরামপ্রদ নগরবাসের এই কি অবদান? এর উপর যদি নিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণ ঘটে! তার ছত্রাকার ধূম্রকুণ্ডলরাশি মহামারণ ডেকে আনতে পারে এবং দূরেও যদি আপনি থাকেন তাহলেও কতটুকু নিস্তার আছে জানি না। N. Waste বা fall out আপনাকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে নয়ত বিকলাঙ্গ পঙ্গুতার অভিশাপ নিয়ে জীবন কাটাতে হবে। পৃথিবীর বহুদেশই এখন এই চরম অস্ত্রের লোভে লালায়িত—আর যদি তা নাও হয় তাহলে আমরা ধীরে ধীরে বৃহৎ শিল্পে যে দেশকে ছেয়ে ফেলব তাতে সন্দেহ নেই। আর সেই সঙ্গে প্রকৃতির নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে দেশের সবুজ বনানীর চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও রাখব না। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভুলে যাব

সবুজ ক্লোরোফিল আমাদের জীবনের অমূল্য রসায়ন জোগানের একটিমাত্র বন্ধু।

প্রকৃতিকে জয় করেছি বলে আমরা গর্ব বোধ করি কিন্তু একটি কথা মনে রাখা বোধহয় ভাল—ফ্রান্সিস্ বেকন বলেছিলেন, Nature to be conquered, must be obeyed.

॥ রবীন্দ্রনাথের কাব্য হতে চয়ন ॥

“মন জানে
এ মাটি আমারি
যেমন এ শাল তরুদারি
বাঁধে নিজ তলবীথি শিকড়ের গভীর বিস্তারে
দূর শতাব্দীর অধিকারে।
হেথা কৃষ্ণচূড়া শাখে ঝরে শ্রাবণের বারি
সে যেন আমারি,
ভোরে ঘুমভাঙ্গা আলো, রাত্রে তারা জলা অন্ধকার
যেন সে আমারি আপনার
এ মাটির সীমাটুকু মাঝে।”



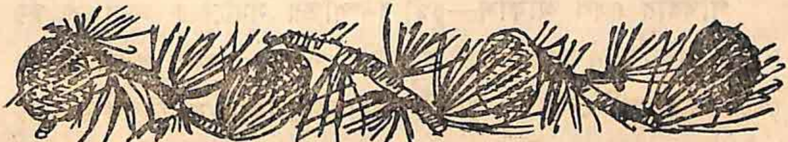
॥ মেঘারণ্য (Cloud forest) ॥

I think that I shall never see
A poem lovely as a tree
A tree whose hungry mouth is prest
Against the earth's sweet flowing,
A tree that looks at God all day
And lifts her leafy arms to pray
A tree that in summer wear
A nest of robins in her hair
Upon whose bosom snow has lain
Who intimately lives with rain
Poems that made by fools like me
But only God can make a tree,

—Joice Kilmer

এবার এক ধরনের জঙ্গলের কথা বলছি যার একটি অসাধারণ ক্ষমতা আছে মেঘ আকর্ষণ করে বৃষ্টি নামানোর—এই অরণ্যের নাম দেওয়া হয় মেঘারণ্য বা cloud forest।

এই জঙ্গলগুলি খুব ঘন হয়, এত ঘন সন্নিবিষ্ট গাছপালা যে মানুষের পক্ষে প্রবেশ করা প্রায় দুঃসাধ্য। কিন্তু যদি কষ্ট করে ভিতরে যাওয়া যায় এবং সাবধানে অগ্রসর হওয়া যায় তাহলে একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। হাঁটার পথে দেখা যাবে ঝরাপাতা ও ফুলের পাপড়ি দিয়ে যেন কার্পেট পাতা। কোথাও নরম মাটি কোথাও কাদা বা জলও থাকতে পারে। মাঝে মাঝে হয়ত চারাগাছ ও ঝোপঝাড়।



সেগুলি সরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সেইসঙ্গে অনুভব করবেন অসহ্য উত্তাপে ঘর্মাক্ত হয়েছেন আপনি।

মাথার উপর ডালগুলি ঝুলে আছে দেখতে পাবেন—সেদিকে নজর রাখুন, হয়ত ঐ ঝুলন্ত ডালে বিষাক্ত সাপ প্রায় অদৃশ্য হয়ে লুকিয়ে আছে। তাছাড়া ঝোপঝাড়ে হয়ত চিতার দর্শন পাবেন কিম্বা বাঘের হুঙ্কার কানে আসবে। প্রতি মুহূর্তে আপনাকে সাবধান থাকতে হবে কারণ ঐ প্রদেশে মানুষের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয় মোটেই।

নীচের মাটিতে কোথাও বা গাছপালা নেই আলোর অভাবে। কোথাও মাটি স্যাঁৎসেতে। কিন্তু যদি উপরদিকে তাকিয়ে দেখেন আপনার মনে হবে এতক্ষণের পরিশ্রম সার্থক হল। আশপাশ দিয়ে যে মোটা মোটা কাণ্ডগুলি ঋজুভাবে উর্ধে উঠে গেছে, অনেক অনেক উর্ধে—যেখানে চোখের দৃষ্টি যেতে চায় না। সেগুলি যেন স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আছে উর্ধ্বলোকে সবুজ পাতার চন্দ্রাতপকে ধারণ করার জন্য। সেখানে পল্লব আর পত্রের রাজ্য যার মধ্য দিয়ে রৌদ্রালোক যেন পরিস্রুত হয়ে নীচে নামছে ম্লান হয়ে। এইসব মহীরূহগুলি সাধারণত ১০০ ফুট থেকে ১৫০ ফুট উচ্চ হয়। কোথাও বা এর দ্বিগুণের বেশি অর্থাৎ ৩৫০ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এত উচ্চ না হলে তারা মেঘকে স্পর্শ করবে কেমন করে? শুধু স্পর্শ করা, নয়ত মেঘ থেকে এরা জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করে নিজদেহে সঞ্চারিত করে এবং বাতাসে বিকীরিত করে। মেঘগুলি অরণ্যের স্পর্শ পেয়ে যেন পৃথিবীর আত্মীয়তা অনুভব করে থমকে দাঁড়ায় এবং বৃষ্টি-উপযোগী তাপ ও বাতাসের উপযুক্ত আর্দ্রতা হলেই প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। আকাশ থেকে বৃষ্টি নামিয়ে এনে ধরিত্রীর জলের অভাব দূর করে বলেই এর আর এক নাম রেইন ফরেষ্ট (Rain forest)।

পৃথিবীর এরূপ আকাশ—চুম্বী বনস্পতির সমারোহ সচরাচর হয় না। তাই রেইন ফরেষ্ট সংখ্যায় বেশি নেই। এগুলি খুঁজে পাওয়া গেছে মাত্র কয়টি দেশে। পৃথিবীর মধ্য ভাগ দিয়ে যে নিরক্ষীয় বলয় বেষ্টন করে আছে তারই আশেপাশে এই সব দেশের অবস্থান। যেমন—

শ্রীলঙ্কায়, পেরুতে, ভেনেজুয়েলায়, সুমাত্রা ও জাভায়, কস্টারিকোতে, ব্রাজিল এবং ইন্দো-মালয় অঞ্চলে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলছেন, পৃথিবীতে এমন মনোরম স্থান আর নেই। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলগুলি ঘিরে যেন অধিকার করে আছে এই বৃষ্টি-অরণ্যগুলি। এই অরণ্যের অভ্যন্তরে সতেজ সবুজ গাছগাছালি লতাপাতায় ভরা, এখানে অপূর্ব ফুলের সৌন্দর্য। কীটপতঙ্গ আর পাখির রূপ-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এমন স্থান সত্যই পৃথিবীতে দুর্লভ। ইন্দো-মালয় অরণ্য যাকে বলা হয় সেটির খণ্ড খণ্ড অংশ দিকে দিকে ছড়ানো। যেমন, একটি সুমাত্রায়, একটি সেলিবিসে। আরগুলি নিউগিনি, ফিলিপিনে ও মালয় উপদ্বীপকে আবৃত করে রেখেছে। তারই দীর্ঘ মালার একটি প্রান্ত এসেছে ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে এবং যেন এখান থেকে চলে গেছে আরও পূর্বে ব্রহ্মদেশের দিকে। 'সেখানেও তার বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান।

মেঘারণ্যের বনষ্পতিগুলি মোটা মোটা স্তম্ভের মত আগেই বলেছি। কিন্তু মসৃণ নয়, তাদের দীর্ঘ উন্নত দেহগুলি আবৃত থাকে শেওলায়, কোথাও বা জানা-অজানা পর-দেহ-জীবী নানা উদ্ভিদে। যেমন, ফার্ণ বা অর্কিড অথবা ক্যাকটাস যারা সেথায় নিশ্চিন্ত আশ্রয় করে নেয়। মাটির প্রয়োজন হয় না এদের। জল ও হাওয়ার মধ্যেই তারা শূন্যেই স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করে এবং সময় হলে সুদৃশ্য বিচিত্রবর্ণ ফুল ফোটায়।

রেইন ফরেষ্টের নিকটবর্তী অঞ্চলে অনাবৃষ্টির আশংকা নেই। এই অরণ্য আশপাশের অঞ্চলকে আর্দ্রতায় ভরিয়ে রাখে। শুধু তাই নয়। জলবায়ু ও ঋতুর উপর এই অরণ্যের দারুণ প্রভাব আছে। বর্ষার জলকে ধরে রাখতে শুধু পারে অরণ্য। অরণ্যহীন ভূমি স্রোতে ধৌত হতে হতে ক্ষয়ে যায় আর সেই ক্ষয়ে যাওয়া মাটি নামে গিয়ে নদীতে, সেখানে পলি পড়তে পড়তে নদীর নাব্যতা কমতে থাকে। আর যখন জলের ঢল নামে সেই অগভীর নদী পরিপূর্ণ হয়ে দুকূল ভাসিয়ে দেয়। তাকেই আমরা বলি বন্যা।

আর যে জমির উপর দিয়ে জলস্রোত এসে নদীতে পড়ে সেই জমিও ক্ষয়ে ক্ষয়ে খাঁজকাটা চিরুণীর মত দাঁড়িয়ে থাকে। রোদে ও বাতাসে শুষ্ক হয়ে সেগুলি পাথরের মত শক্ত হতে থাকে। একেই বলে erosion এখানে কোনোদিন আবাদ করা বা শস্য ফলানো সম্ভব হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন না।

The woods please us above as things.

—**Virgil**



॥ 'গাছকে জড়িয়ে ধরো' ॥

Woodman, spare the tree
Toch not a single bough,
In youth it sheltered me
And I will protect him now.
—G. Pope Morris.

"গাছকে জড়িয়ে ধরো" এই রব তুলে, যতদূর জানি পৃথিবীতে কোথাও কোনো আন্দোলন হয়নি। গাছ কাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এই 'চিপকো' আন্দোলন শুরু হয়েছে ভারতের উত্তর-প্রদেশে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে আছেন একটি আশ্চর্য মানুষ যার নাম সুন্দরলাল বহুগুণা।

কিছুদিন আগে বহুগুণাজী কলকাতায় এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করার পর সাংবাদিক বিক্রমণ নায়ার মহাশয়ের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি। "সদালাপী বহুগুণাজীর টুকরো টুকরো কথা জোড়া দিয়ে যা পাওয়া যায় তা হল, গাছ কাটার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় ১৯৭২ সালে উত্তরপ্রদেশের চামোলি জেলায়। ডিসেম্বর মাসে স্থানীয় অধিবাসীরা একটা প্রতিবাদ মিছিলে মিলিত হন। ওঁদের দাবী ছিল সরকারী বননীতির আমূল সংস্কার চাই। যা সাধারণত বন সম্পদকে লোপাট করে তেমন বড় বড় কারখানা চাই না, চাই বনভিত্তিক ছোট কারখানা, চাই কুটির শিল্প। কয়েকদিনের মধ্যেই এই মিছিলের ডাক ছড়িয়ে পড়ে কাছে-দূরে—উত্তরকাশী, গোপেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চলে।

চার মাস পরে চামোলির জঙ্গলে হানা দিল যারা খেলার সরঞ্জাম তৈরি করে এমন একটি সংস্থার লোকজন। উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট, খেলার সরঞ্জাম তৈরি হয় এমন গাছ কাটা। বে-আইনী কিছু নয়। তাদের কাছে ছিল ৫০টি 'আঙ্গু' গাছ কাটার সরকারী অনুমতি পত্র। কিন্তু মজা এই যে, স্থানীয় বনবাসী ও গ্রামবাসীদের আঙ্গু গাছ কাটা নিষিদ্ধ। এমন কি চাষের লাঙ্গল তৈরির জন্যও নয়। ঐ গাছে নাকি উৎকৃষ্ট লাঙ্গল তৈরি হয়। তার কারণ এটা বৈজ্ঞানিক বনসংরক্ষণ নীতির বিরোধী।

ঐ সংস্থার ভাড়া করা লোকেরা যন্ত্রপাতি নিয়ে যেই গাছে করাত ঠেকাতে গেল অমনি গ্রামবাসীরা জড়িয়ে ধরল গাছকে—"আগে আমাদের কাটো, তারপর গাছ কাটবে। আগে প্রাণ দেব তারপরে গাছ"। এই হল ওদের শ্লোগান। শুরু হল 'চিপকো' আন্দোলন। প্রথম দিকে অর্থনৈতিক দাবীগুলি ছিল প্রধান কথা, যেমন, গাছ কাটার জন্য ঠিকাদারি প্রথার বিলোপ, স্থানীয় লোকেদের সস্তাদরে বন সম্পদ দিতে হবে, গড়ে তুলতে হবে বনভিত্তিক কারখানা, চাই বনকর্মীদের ন্যায্য মজুরি।

বছর চারেকের মধ্যে এই আন্দোলন আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং তার রূপও গেল বদলে। প্রতিবাদ আন্দোলন রূপান্তরিত হল পরিবেশ আন্দোলনে।"

এই সময়ের কিছু আগে থেকেই পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধে দেশ বিদেশের মানুষের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। প্রধানত বাতাস ও জল দূষিত হলে মানুষের জীবন যে বিপন্ন হবে এ যেমন সরল সত্য তেমনি বায়ুকে দূষণমুক্ত করতে বৃক্ষের পত্র পল্লব তথা অরণ্যের একটা অপরিহার্য ভূমিকা আছে এও স্বীকৃত সত্য। আমাদের দেশেও বহু পূর্বেই অরণ্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নীতি ঘোষিত হয়েছে এবং অনেকগুলি অরণ্যকে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

দেখা যাক, উত্তরপ্রদেশের ঐ বিশেষ আন্দোলন কি ভাবে পরিচালিত হয়েছিল।

গ্রামবাসীরা গাছ কাটা বন্ধ ত করলই তার সঙ্গে গাছের আঠা থেকে যে রেজিন তৈরি হয় তাও তৈরি করা বন্ধ করল। আঠা সংগ্রহ করতে গাছের ছালকে কেটে কেটে দিতে হয়, গ্রামবাসীদের কাছে তাও অসহ্য। গাছের গায়ে পুরানো কাটা স্থান বা ক্ষতগুলিকে তারা মাটির প্রলেপে বা অন্য কিছু লাগিয়ে ভরাট করে দিল। আদবানি জঙ্গলে গাঁয়ের মেয়েরা ত গাছের সঙ্গে রাখীবন্ধন করে বসল গাছের গায়ে রেশমের কোমল সুতো জড়িয়ে। সবার জেহাদ হল, গাছের কাঠ নয়, আঠা নয়, মুনাফা নয়—চাই শুদ্ধ মাটি জল আর হাওয়া —এই রব উঠল হিমালয় উপত্যকার সর্বত্র।

বহুগুণাজীর এক সহকর্মী ধুম সিং নেগি বৃক্ষ বিধ্বংসী কুড়ুলকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বললেন—'আগে আমায় কাট, পরে গাছ কাটবে।' স্থানীয় কবি ঘনশ্যাম শিলানির রচিত ছড়া লোকের মুখে মুখে ফেরে,

"গাছকে জড়িয়ে ধরো
যেন কেউ না কাটে
পাহাড়ের ধন যেন কেউ না লোটে।"

টেহরি গাড়োয়ালের জনপ্রিয় সর্বোদয় কর্মী সুন্দরলাল বহুগুণা এই আন্দোলনের পুরোভাগে আছেন তখন থেকেই।

বহুগুণাজী ছিলেন সেই ধরনের গান্ধীবাদী কংগ্রেসকর্মী যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকে রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক। তিনি ১৭ বৎসর বয়সে একবার ইংরেজের জেলে গিয়েছিলেন। কংগ্রেস শাসকের জেলেও গেছেন দু'বার। ক্ষমতার সিঁড়ির তলায় যে কংগ্রেসীদের ভিড় দেখা যায় সেখানে ছিলেন না বহুগুণাজী। বছর ছয়েক আগে বন দপ্তরের কাছে বন-কাটার কাজে বাধা দান করতে গিয়ে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হন এবং এক মাস কারাবরণ করেন।

তারপরেই তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেন এবং অস্পৃশ্য ভাঙ্গিদের জন্য পাঠশালা খোলা ও মাদক দ্রব্য বর্জনের প্রচার প্রভৃতি এই সব কাজ করেন গাড়োয়াল অঞ্চলে। এই সময় গান্ধীজীর স্নেহধন্যা

সর্বোদয় কর্মী মীরা বেন ও সরল্য বেন তাঁকে টানেন। তাঁরা ডাক দিলেন অন্যদিকে—সেদিকটি হল অরণ্য নিধনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিকে। এই দুই মমতাময়ী নারীর কাছে বহুগুণাজী যে কত ঋণী সে কথা তাঁর 'হিমালয়কে বাঁচাও' বইটিতে লিখেছেন। তাঁদের স্নেহস্পর্শে তিনি অরণ্য রক্ষণের কাজে নামলেন।

বহুগুণাজী এই পথে এসে তাঁর সংগ্রামকে এক নতুন আধ্যাত্মিকতা মণ্ডিত করেন যেমন করেছিলেন গান্ধীজী। সুন্দরলাল তাঁর আদর্শের উৎস নির্দেশ করেন বেদে, পুরাণে। তিনি বলেছেন, কথিত আছে, মহামুনি বেদব্যাস তাঁর অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেছিলেন বদ্রিবনে, তারপর বুদ্ধদেব যে আত্মদর্শন করেছিলেন সেও সেই বোধি বৃক্ষের মূলে। মৎস্যপুরাণ উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, তাতে কথিত আছে "একটি বৃক্ষ দশটি পুত্রের সমান।" এ কথাত সত্যি যে, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের সঙ্গে অরণ্যের একটি গভীর মমতার সম্পর্ক ছিল। বনসম্পদ লুটে নেওয়া কিম্বা জঙ্গলকে একটা ব্যবসার বস্তু করে তোলা নিতান্তই অসাধু এবং দেশের পক্ষে অমঙ্গলকর ব্যাপার।

ঐতিহাসিকেরা জানেন ১৭৩০ সালে যোধপুরের রাজা উৎকৃষ্ট কাঠ দিয়ে একটি প্রাসাদ বানাবেন সংকল্প করেন। কাঠ সংগ্রহের জন্য জঙ্গলে লোক পাঠালেন। সেই সময় অমৃতা দেবীর নেতৃত্বে গ্রামবাসী ও বনবাসীর একদল সেই লোকদের বাধা দিলেন। তার ফলে বাধল সংঘর্ষ। অমৃতা ও তিনশ লোক প্রাণ দিলেন। ইংরেজ আমলেও এরূপ ঘটনা ঘটেছে। ১৯৩৩ সালে জঙ্গল হস্তগত করার পর তিলরি গ্রামে ঐরূপ এক সংঘর্ষে ২৭ জন প্রাণ হারাল। আজ তাই হিমালয়ের কোলে সেই তিলরি গ্রাম অরণ্য প্রেমীদের একটি তীর্থস্থান।

রাজস্ব লোভী সরকার, অসাধু ঠিকাদারদের দুষ্ট চক্র এবং আমলাদের হাত থেকে বনকে বাঁচানো যে একান্ত দরকার এ বিষয়ে বহুগুণাজী আপোষহীন।

রাজনীতির ফাঁদ তিনি এড়িয়ে চলেন। তিনি বলেন, বনসংরক্ষণ একটি লোকায়ত আন্দোলন—রাজনৈতিক পরিচয় যাই হোক না কেন সবাই এর সামিল হতে পারেন—এইটিই তাঁর আবেদন।

আরেকটা প্রশ্নের উত্তরে বহুগুণাজী বললেন, আসল কথা কি জানেন? ক্ষমতায় এসে গেলে অনেকেই মত বদলাবেন। তখন বনকে ওঁরাও দেখবেন রাজস্বের উৎস হিসাবে। ইন্দিরা গান্ধী এবং চরণ সিং 'চিপকো' আন্দোলনকে অবশ্য সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তখন কি জানেন? ওঁরা কেউই ক্ষমতায় ছিলেন না। আমার ধারণা এই যে, গদিতে বসলে ওঁদের মগজ ধোলাই হয়ে যায়। আমাদের পথ অরাজনীতি এবং অহিংসা।"

আর একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল বহুগুণাজীর কাছে। সেটি হল, আপনি ত জানেন এশিয়া বিশেষ করে ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা ক্রমবর্ধমান—এই মানুষগুলোর বসবাসের সামান্য জায়গাও ত চাই। তার জন্যে বনভূমির ক্ষয় আপনারা রোধ করবেন কি করে? শুধু তাই নয়। ভারতের শিল্পোন্নয়নের দিক দিয়ে দেখতে গেলে জল-বিদ্যুৎ, তাপ বিদ্যুৎ প্রভৃতি অনেক প্রকল্প হাতে নিয়ে সরকারকে কাজ করতে হবে। সেইসব শিল্পোদ্যোগের জন্য স্থান চাই এবং কাঠও একটি অপরিহার্য প্রয়োজন। কাগজ তৈরির জন্যও ব্যাপক কাঠের চাহিদা রয়েছে। এখানে ক্ষুদ্র শিল্প কি অসহায় নয়? য়ুরোপ-আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সভ্য উন্নত দেশে কাঠের মূল্য যেমন দিন দিন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে চাহিদাও—সেই চাহিদা পূরণের জন্য সরকার ব্যবসায়ী, ঠিকাদার ও আমলাতন্ত্র এদের এক অসাধু শক্তিশালী কৌশল ও প্রভাবকে বাস্তব বলে স্বীকার করতেই হবে। এক্ষেত্রে আপনার সংগ্রাম আরও তীব্রতর হবে তা বুঝতে পারি কিন্তু জয় সম্বন্ধে কি নিঃসন্দেহ হওয়া যায়?

বহুগুণাজী শুনলেন, একটু চুপ করে থেকে বললেন, "দেখুন আমরা দেশের এবং তাবৎ মানুষের স্বার্থেই সংগ্রাম করছি। আমাদের নিজেদের কোনো স্বার্থ নেই। তাই আমরা আশা করতে পারি জয়লাভ আমাদের হবেই।

আর যে জনবিস্ফোরণের কথা বললেন, সে সম্বন্ধে সর্বোদয় কর্মী হিসাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ছাড়া আর কিছু আমাদের করবার

উত্তর প্রদেশ সরকার এক হাজার মিটারের চেয়ে উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে ব্যবসার জন্যে সমস্ত রকমের গাছ কাটা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। হিমাচল সরকার আগামী পাঁচ বছরে সমগ্র বনাঞ্চল রাষ্ট্রায়ত্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু আমলা আর ঠিকাদার, যারা সব চেয়ে বেশি দায়ী সর্বনাশের জন্য, তাদের মধ্যে যোগসাজস এখনো থেকে গেছে। এদের পেছনে রয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকার খেলা। কাশ্মীরে ১৯৪৭ সালে বনাঞ্চলের রাজস্ব ছিল ৮৫ লাখ টাকা। ১৯৮১/৮২ সালে সেই রাজস্ব বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ কোটিতে। হিমাচল প্রদেশে গত পাঁচ বছরে এই রাজস্ব বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে।

চিপকো আন্দোলনের সংগঠকরা উত্তর প্রদেশে বন বিভাগের ২০জন অফিসারের একটা তালিকা দিয়েছেন। এইসব অফিসাররা সামান্য মাহিনার চাকরি করেন অথচ দেরাতুনের মত জায়গায় বিলাস-বহুল বাংলো তৈরি করেছেন। তাঁদের এই অভিযোগ সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য এখনও জানা যায় নি।

ঋষিকল্প এই নির্লোভ মানুষটিকে মনে হয় যেন ভারতীয় সাধনার একটি মূর্ত প্রতীক। তবে একটা প্রশ্ন আমরা বহুগুণাজীর কাছে সবিনয়ে রাখতে চাই যে, উনি কি আশা করেন যে, আমাদের দেশের এই ৮০ কোটি নরনারী ওঁর মত চাল গম ভুট্টা জোয়ার ইত্যাদি দানা শস্য আহার ত্যাগ করে থাকতে পারবে। কৃষিকার্য কি সত্যই কোনোদিন পরিত্যক্ত হতে পারবে? তাছাড়া এর বিকল্প আহারই বা কি হবে?

আর একটা কথা, বনক্ষয় রোধ করতে উনি সংগ্রামশীল কিন্তু বনসৃজনে ওঁর উৎসাহের অভাব কেন?



॥ সালোক সংশ্লেষ (Photo-synthesis ॥

কোথা হতে পেলে তুমি অতি পুরাতন
এ যৌবন
হে তরু নবীন
প্রতিদিন
জরাকে ঝরাও তুমি কী নিগূঢ় তেজে
প্রতিদিন আস তুমি সেজে
সদ্য জীবনের মহিমায়।
—রবীন্দ্রনাথ

সদ্য জীবনের মহিমায় তরুর চিরনবীনতা কবিচিত্তকে আলোড়িত করেছে।

কবি রবীন্দ্রনাথ অসীম আগ্রহ নিয়ে বনস্পতি ও উদ্ভিদ জীবনকে লক্ষ করেছেন এবং এই বিষয়ে তাঁর চমৎকার চিন্তাগুলি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁর লেখার বিভিন্ন স্থানে। এক জায়গায় তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে যা বলেছেন তার মর্ম হল, একটা গাছের অভ্যন্তরে যেন একটা কারখানা চলেছে, অথচ বাহিরে তার প্রকাশ নেই, উপরে তার শ্রীমণ্ডিত একটি প্রশান্তি। ধীর মন্থর গতিতে তার পত্র পল্লব গজাচ্ছে, ফুল ফুটছে, যেন কোনো তাড়া নেই। অথচ ভিতরে কী কর্মব্যস্ততা!

সত্যই তাই, বিজ্ঞানীরাও ঐ একই সুরে বলেছেন, একটি বৃক্ষ মাটির অভ্যন্তর থেকে আশ্চর্য কৌশলে রস সংগ্রহ করে এবং সেটি উর্ধ্বে নিয়ে যায় তার কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখার মধ্যে দিয়ে একেবারে প্রান্ত-সীমায় যেখানে তার পত্র পল্লবের বিকাশ। একটি বৃক্ষ যদি সুদীর্ঘ

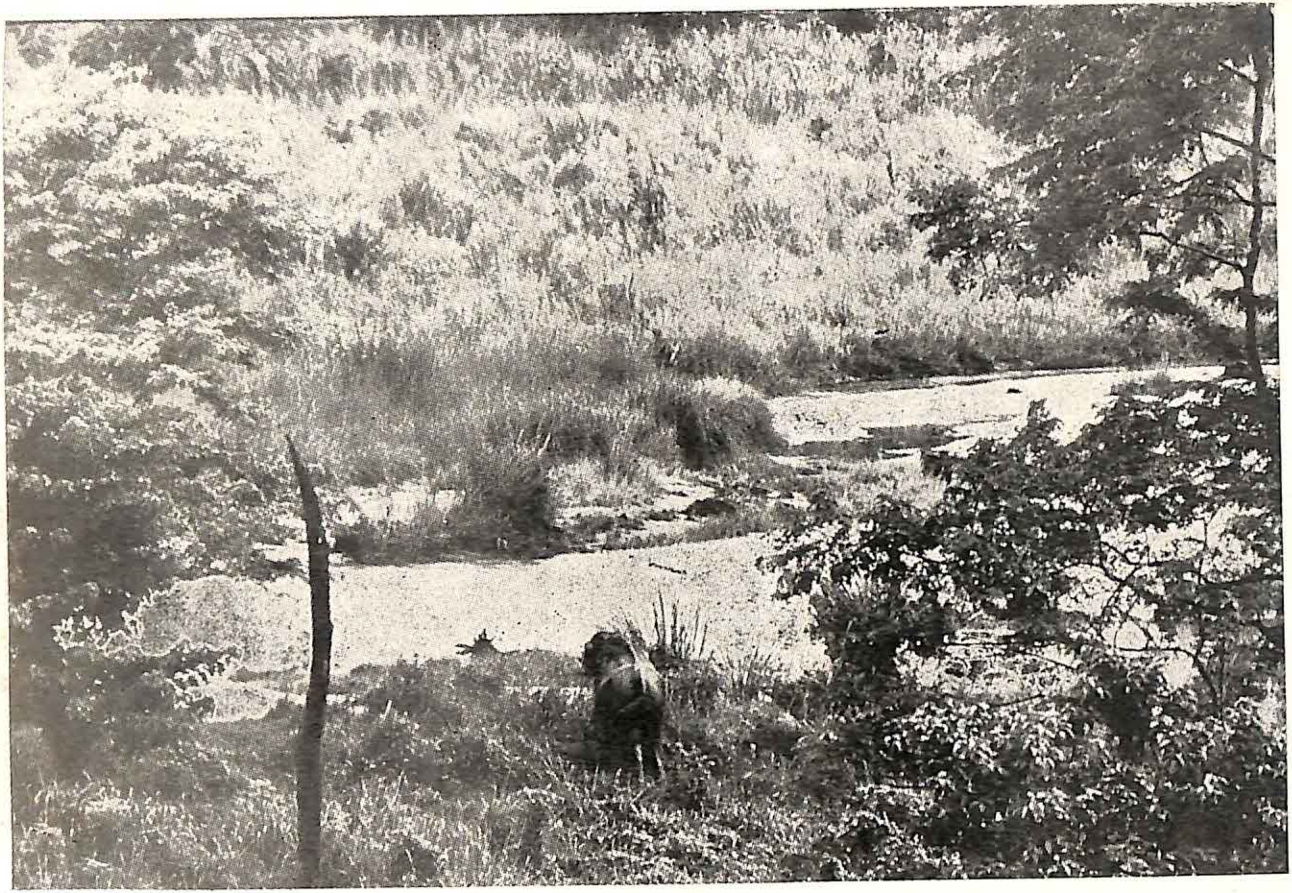


একটি মহীরুহ হয় যার উচ্চতা ২০০ কিম্বা ২৫০ ফুট অর্থাৎ একটি ২৫ তলা বাড়ির ছাদের সমান হয় তাহলে মাটির নীচে থেকে অতখানি উচ্চে নিয়মিত জল সরবরাহ করার কথাটা চিন্তা করুন, নেহাৎ সহজ নয় আমাদের পক্ষে। যন্ত্রের সাহায্য নিতে হলে আমাদের দরকার হত একটি ২/৩ অশ্বশক্তির মোটর এবং একটি পাম্প। সেটি চালাবার জন্য পেট্রোল বা ডিজেল বা ইলেকট্রিসিটি দরকার হত নিশ্চয়ই এবং এই যন্ত্র দিবারাত্র তার ঘর্ঘর আওয়াজে দশদিক মুখরিত করে দিত। কিন্তু বৃক্ষ এই কাজটি করছে নীরবে নিঃশব্দে, তার কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। সে শুধু রস সম্ভার উর্ধ্বে তুলছে না। তার পত্রে পত্রে পুষ্পে পল্লবে বিতরণ করছে সেই রস এমন সহজে এবং অবলীলাক্রমে যা আমাদের ধারণার অতীত।

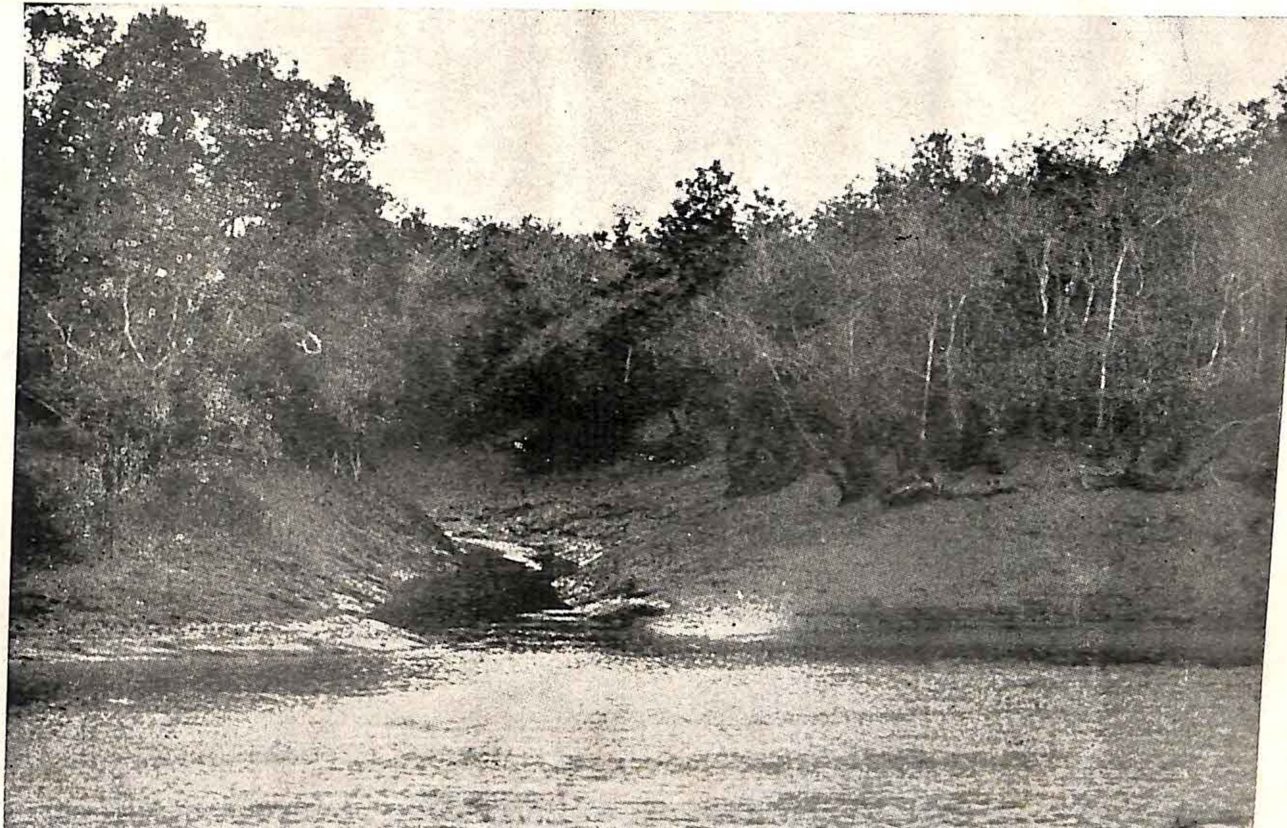
উদ্ভিদের জল শোষণ ও সেই রস উচ্চে উত্তোলন আপাত দৃষ্টিতে একটি রহস্যময় ব্যাপার মনে হয়। এটিকে ব্যাখ্যা করতে অনেকগুলি মতবাদ আছে। একটি মতবাদ বলছে পাতার কোষে জল বাষ্পীভূত হয়ে গেলে একটা ফাঁক (Vacuum) সৃষ্টি হয় যেটিকে পূরণ করতে তার অব্যবহিত পরের কোষ থেকে রস প্রবাহিত হয়। এইভাবে পর পর কোষগুলি, মূল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ক্রমাগত উপর দিকে জল সরবরাহ করছে। কিন্তু অতি দীর্ঘ আমেরিকার 'রেড উড' গাছ যা ৪৫০ ফুটও উঁচু হতে পারে। তার শীর্ষদেশে রাশি রাশি জল তোলার গুরুতর কার্য এই মতবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

আমাদের দেশের বিজ্ঞানী আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র কিন্তু এর যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, বায়ুর চাপ, কৈশিক নলের মধ্যে দিয়ে জল প্রবাহ, শিকড়ের চাপ বা আস্রবণ (Osmosis) এই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা হতে পারে না। তিনি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, এই জলশোষণ ক্রিয়া শারীরতাত্ত্বিক ঘটনা। যান্ত্রিক (mechanical) পদ্ধতি নয়। গাছের জীবন্ত কোষগুলির স্পন্দন শক্তিই গাছের জল শোষণ ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

এটিত গেল তার কর্মকাণ্ডের একটি পর্ব। পত্রের কোষে কোষে



তরাই-এর নদী-প্লাবিত ঘাসের বন



সুন্দরবনের ম্যাংগ্রোভ জঙ্গল

রস জমা হল এবং সে কোষগুলির গঠন অতি বিচিত্র। কোষের অভ্যন্তরে আছে একটি সবুজ পদার্থ—তার নাম ক্লোরোপ্লাস্ট। এই ক্লোরোপ্লাস্ট কণার মধ্যে ক্লোরোফিল অণু থাকে। প্রতিটি কণাতে আছে কয়েক শো কোটি ক্লোরোফিল অণু। এই অণুগুলি প্রস্তুত হয়েই থাকে, শুধু অপেক্ষা করে সূর্যালোকের। সূর্যরশ্মি এসে প্রভাতে যেন সবুজ পত্রগুলির ঘুম ভাঙিয়ে জাগিয়ে দেয়। আর তখনই তাদের কাজ শুরু হয়ে যায়। সবুজ ক্লোরোফিল সূর্যালোকের কিছুটা শোষণ করে এবং তারই সাহায্যে সে এক অসাধ্য সাধন করে। সে জল এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে শর্করা জাতীয় (Carbohydrate) বস্তু তৈরি করে। এই শর্করা আবার বিভিন্ন বিক্রিয়ার ফলে স্টার্চ, সেলুলোজ, ফ্যাট বা তৈল জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। এই শর্করা উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে জল কণার যে অক্সিজেন সেটিও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং কোষ থেকে অপসারিত হয়ে বাতাসে মিশ্রিত হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে সালোক-সংশ্লেষ বা ফটোসিন্‌থেসিস।

বাতাসের উপাদান হল মোটামুটি দুটি গ্যাস, নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন, তাছাড়া জলীয় বাষ্প, হিলিয়াম ইত্যাদি মাত্র ছিটে ফোঁটা থাকে। বাতাস দূষণের ফলে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং অক্সিজেন কমে যায়। গাছের সবুজ পত্রাংশ সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে কাজটি করে তা হল : জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড এই দুটিকে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষ করে একদিকে শর্করা ও অন্যদিকে অক্সিজেন তৈরি করা। শর্করাটি সে গ্রহণ করে তার পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য আর মূল্যবান অক্সিজেন সে ফিরিয়ে দেয় বাতাসের মধ্যে। এই দুরূহ কাজটি সে যে কী কৌশলে করে সে মন্ত্র আমাদের আজও জানা হয় নি। আমাদের বিজ্ঞান আজও অত সহজে পারেনি জলকে (H_2O) বিশ্লেষণ করে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে পৃথক করতে যে অক্সিজেন পৃথিবীর জীবলোকের প্রাণস্বরূপ।

এই যে রাসায়নিক প্রাক্রিয়াটির কথা বলা হল, এটি অত্যন্ত জটিল

প্রক্রিয়া সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি প্রতিদিন ঘটছে এত সহজ ও সাবলীলভাবে যে বোঝবার উপায় নেই। এর জন্যে গাছের কোনো যন্ত্রপাতি বা ল্যাবরেটরী লাগে না। বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রকৃতি কত অনায়াসে যে এই প্রক্রিয়াটি করে চলছে তা কল্পনা করাও কঠিন। তাঁরা আরো বলেন, পৃথিবীতে বোধহয় এরূপ জটিল কাজ এত সহজভাবে করার কোনো নজির নেই। এখানে গাছের পত্রের সবুজ পত্র-অন্তর্গত ক্লোরোফিলের যে শক্তিটুকু লাগে তা সূর্যালোক থেকে সে সংগ্রহ করে। এখানেও সে আরো একটা মহৎ কাজ করছে—যেটি হল পৃথিবীর বুকে যতটা সৌরশক্তি পতিত হয় তার প্রায় ৮ শতাংশ সালোক-সংশ্লেষ দিয়ে সে বেঁধে রাখতে পারে। এই শক্তিই সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের শক্তির উৎস স্বরূপ। জীবদেহের প্রতি কোষে কোষে অবিরাম যে দহন ক্রিয়া হয়ে যাচ্ছে সেই খাদ্যবস্তুর দহন থেকে উৎপন্ন তাপ আমাদের দেহের উষ্ণতা রক্ষা করে এবং তা থেকে আমরা পাই কর্মশক্তি।

যতক্ষণ সূর্যালোক থাকে ততক্ষণ সর্বত্র সবার দৃষ্টির অন্তরালে নীরবে চলছে এই শক্তি আহরণ। শর্করা প্রভৃতি খাদ্যবস্তুতে সঞ্চিত হতে থাকে সেই শক্তি এবং সেটিই আমাদের কর্মচঞ্চলতার উৎস। আমরা লিখি, পড়ি, ফসল কাটি, মোট বই, রিক্সা টানি, আবার চিন্তা করি—প্রতিটি কর্মের জন্য শক্তি লাগে। সেই শক্তি সবুজের কোষে কোষে শর্করার জারণ থেকেই লাভ করি আমরা।

শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য প্রতি মুহূর্তে আমাদের অক্সিজেন প্রয়োজন। ক্লোরোফিলের আনুকূল্যে তা আমরা লাভ করি বাতাসের মাধ্যমে। ক্লোরোফিল কিন্তু এই নিতান্ত জরুরী বিক্রিয়াটি ঘটিয়ে নিজে অবিকৃত থাকে। তাই তাকে অনুঘটক বলা যায় (Calalyst)। এই বিক্রিয়া কোনো কারণে যদি বৃক্ষপত্র না করে অথবা পৃথিবী যদি একেবারে অটবীশূন্য হয়ে যায় তাহলে কি হবে?

বাতাসের যেটুকু অক্সিজেন তার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হলে ২০ শতাংশ (কলকাতায় বা শিল্পাঞ্চলে বড় জোর ১৭ শতাংশ) আমরা

অল্পকালের মধ্যেই সেটুকু শেষ করে ফেলব, তারপর জীবনের অস্তিত্ব লোপ পাবে। শুধু তাই নয়। সেই সময়ের মধ্যে আমরা প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি করে বাতাসকে আরো দূষিত করে তুলব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উদ্ভিদ ভিন্ন জীব জগতে প্রাণরক্ষার উপায় নেই।

বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। একটি ভাগে যারা পড়ে তারা অন্য প্রাণী বা উদ্ভিদকে গ্রাস করে আত্মসাৎ করে। অন্য ভাগে পড়ে এমন প্রাণী যারা বস্তু উদ্ভিদ ও প্রাণীকে গ্রাস না করে বিভিন্ন মৌলে বিশ্লেষ (decompose) করে। কিন্তু উদ্ভিদের মত এমন আর কোনো জীবের সন্ধান আমরা জানি না যারা শুধুমাত্র জল ও বাতাস থেকে নানা বিক্রিয়া সংঘটিত করে আপন আহার্য উৎপাদন করে নিতে পারে।

সৃষ্টিকর্তাকে পরম বিজ্ঞানী বলতে হয়, কেননা তিনি এই বসুন্ধরাকে এমন একটি চিরশ্যামল বনাঞ্চল দিয়ে আবৃত করে রেখেছেন যে, সেই শ্যামলিমা অফুরান রৌদ্রালোকের প্রাচুর্য থেকে নিজের আহার্য সংগ্রহ ত করেই সেই সঙ্গে সমগ্র জীবলোককে অকৃপণভাবে খাদ্য এবং প্রাণবায়ু রূপ সঞ্জীবন প্রদান করে বাঁচিয়ে রেখেছে লক্ষ কোটি বৎসর ধরে।

Great trees are long in growing
But they are rooted up in a single hour
—From Latin



॥ অরণ্যক্ষয় (deforestation) ॥

"More than 50% of the world's annual wood production is utilised as fuel and of this 90% is used in the developing world."

F. A. O. (1971)

কোনো একটি নগরের যাবতীয় লোকের শুধু রান্নার জ্বালানি কাঠ যা লাগে তা সংগ্রহ করতে ১৩০ কিলোমিটার প্রশস্ত বৃত্তাকার একটি অরণ্যের বৃক্ষ সমূহের ডাল পালা ছাঁটাই করা হয়েছিল। এ ঘটনা আফ্রিকার আপার ভোল্টার রাজধানীতে ঘটে।

হাইতি একটি ছোট দ্বীপ, সেখানকার মালভূমি ও পর্বত মালাকে বৃক্ষশূন্য করে সবুজের আবরণ এমন ভাবে মুছে দেওয়া হয়েছে যে সেগুলি যেন পাথরের কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। ব্রাজিলে আমাজনীয় অঞ্চলের বিশাল অরণ্যানী যা এককালে পৃথিবীর বৃহত্তম বলে গণ্য করা হত তার অবস্থা এখন ধ্বংসের মুখে। মানুষ বহুদিন থেকে কাঠের লোভে চেষ্টা করেছে তার মধ্যে প্রবেশ করতে—কিন্তু পারেনি। সেই দুর্ভেদ্য অরণ্য প্রদেশে প্রবেশ করার সাধ্য ছিল না মানুষের। কাঁটা ঝোপ আর হিংস্র শ্বাপদ যেমন ভয়ের কারণ ছিল তেমনি বিষধর কীট্ট পতঙ্গ ও সরীসৃপের ভয়ও কম ছিল না। কিন্তু এখন আর অরণ্যের নিরাপত্তা নেই। আধুনিক অস্ত্রে ও যন্ত্রে সজ্জিত মানুষ বুলডোজার আর বৈদ্যুতিক করাত নিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করে অবাধ ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে। হাইওয়ে (Highway) তৈরি হচ্ছে বনাঞ্চলের

ভিতর দিয়ে এবং জনপদ সৃষ্টির দ্রুত প্রয়াস চলছে। উচ্চ মানের ব্রাজিলিয়ান কাঠ চড়া দরে বিক্রী হয়ে অনেক টাকা ঘরে আনছে সত্য কিন্তু ব্রাজিল আজ যা হারাচ্ছে আর কি কখনও তা পাবে ? অরণ্য-মুক্ত অঞ্চলের জলবায়ু বদলে গেছে। কোথাও বৃষ্টি হয় কোথাও একেবারেই হয় না। যে জমি উদ্ধার করা হয়েছে সেখানে চাষও ভাল হয় না।

বিশেষজ্ঞদের হিসাবে ১৯৫০ সাল থেকে বর্তমান কালের মধ্যে পৃথিবীর সমগ্র অরণ্য সম্পদ যা ছিল তার অর্ধেক ধ্বংস হয়ে গেছে। বছরে এখন ১০ থেকে ২০ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। আরও স্পষ্ট করে তাঁরা বলছেন, প্রতি বৎসর কিউবার যতখানি আয়তন অর্থাৎ আমাদের শ্রীলঙ্কার আয়তনের পৌনে দু'গুণ ভূভাগ (প্রায় ৪৩০০০ বর্গ মাইল ভূভাগ) বনহীন হয়ে যাচ্ছে। "এই ভাবে এবং এই হারে ধ্বংস-ক্রিয়া চললে," পরিবেশ বিজ্ঞানী এরিক একহোম বলেন, "নতুন শতাব্দীতে এখানে ওখানে বনভূমির কিছু কিছু চিহ্ন-মাত্র অবশিষ্ট থাকবে।"

আমাদের এক বন্ধু ডাক্তার এবং অরণ্যপ্রেমিক বলছিলেন, "আমি থাকি সিংভূমে একটি ছোট পাহাড়ের চূড়ায়। চারদিকে পাহাড়ী জঙ্গল। অনেকদিন আছি ওখানে, আগে ঘন বনের মধ্য দিয়ে ছিল রাস্তা। মাঝে মাঝে বাঘ ও ভালুকের পাল্লায়ও পড়েছি। কিন্তু সেও ভাল লাগত। আজ সেই জঙ্গল একেবারে বিলুপ্ত ! শুকনো পাথুরে মাটির চড়াই ভেঙ্গে হাঁটতে হয়। শ্বাপদের ভয় নেই বটে কিন্তু রোমাঞ্চিত হবার আনন্দই বা কোথায় ?"

আমাদের দেশে এই ভাবে বনক্ষয় কোথায় হচ্ছে না ? নেপালের দিকে তাকিয়ে দেখুন। জনবসতির চাপে পড়ে ওরা বন কেটে বসত বানাচ্ছে। বেশ, তা বানাক, কিন্তু ফলে কি হচ্ছে ? বৃষ্টির জল ঢালু ন্যাড়া জমির সমস্ত মাটি ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যেখানে ঘন বসতি হয়ত সেখানে কিছু অরণ্যের অবশিষ্ট আছে। অদূর ভবিষ্যতে তাও কাটা হয়ে যাবে। এখনই ফসলের ফলন কমেছে, পরে আরো কমবে।

বিদেশী অর্থ সাহায্যে যে সব মূল্যবান রাস্তা তৈরি হচ্ছে বা হয়েছিল সেগুলি সব বিধ্বংসী ধ্বসের ফলে নদীগর্ভে আশ্রয় নিচ্ছে।

ভারতবর্ষে বনক্ষয় আরো শোচনীয়। এখানে আগের তুলনায় বন্যার প্রকোপ অনেক বেড়ে গেছে এবং তদ্বারা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও অনেক বেশী।

জর্জ লিডেক, যিনি মার্কিন দেশে প্রাকৃতিক সঙ্গতি সংরক্ষক কাউন্সিলের উচ্চপদে ছিলেন, ভারতে এসে বিশেষ করে এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি বলেন, "ভারতে ভূমিক্ষয় ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এখানে কমপক্ষে প্রতি বছর ৬০০০ মিলিয়ন টন (ছ'শো কোটি টন) জমির উপরিস্থ মাটি (top soil) নদীর স্রোতে ধুয়ে যাচ্ছে। এর অর্থ হল জন প্রতি ১০ টন মাটি নদীর গর্ভে চলে যায়।" তিনি আরও বলেছেন, "পাশাপাশি ছুটি দেশের মধ্যে সীমানা নিষ্পত্তি ব্যাপারে অনেক সময় এক মিটার জমি নিয়ে বিরোধ বাধে এবং এই বিরোধ কত সময় যুদ্ধে পরিণত হয়। এক মিটার জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ অথচ অন্য দিকে দেখুন লক্ষ্য লক্ষ টন জমির মাটি নিছক অজ্ঞতায় বা অবহেলায় নদীর জলে ধুয়ে যায় অথবা erosion কবলিত হয়ে মরুপ্রায় অঞ্চলে পরিণত হয় এবং প্রতি বছরই এ ঘটনা ঘটছে। দেশের মানুষ তার খবরও রাখে না।"

এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশের দেশগুলির দিকে তাকালে ঐ একই প্রকার ভয়াবহ ছবি চোখে পড়বে। ঐ দেশগুলির সবই জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। শুধু তাই নয়। সেই অরণ্যে পৃথিবীর সব চেয়ে মুল্যবান কাঠ উৎপন্ন হত। খাদ্যের তাগিদে চাষের প্রয়োজন, তাই সেখানেও "কাটো আর পোড়াও" নীতি অবলম্বিত হল। চাষীরা জঙ্গলমুক্ত প্রচুর জমি পেল, চাষও করল। কিন্তু পর পর কয়েক বছর চাষের পর ফলন কমতে লাগল। ক্রমে সেই জমি অফলা হয়ে যায়। জমির সন্ধানে চাষীরা আবার জঙ্গলের আরো গভীরে চলে যায়। তাদের সঙ্গে হাত মেলায় টিম্বার লোভী ব্যবসায়ীরা। যৌথ উদ্যোগে বৃক্ষ নিধন যজ্ঞ চলতে থাকে। এইভাবেই শক্ত কাঠের (hard wood)

পীঠস্থান যে ফিলিপিনস্ ও ইন্দোনেশিয়া-র নিম্নভূমি সমস্তই একেবারে বৃক্ষশূন্য হয়ে যেতে আর বেশি দেরি নেই। যে থাইল্যাণ্ড পূর্ব্বে কাঠ রপ্তানি করে দেশ বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ আয় করত, সে এখন নিজের প্রয়োজন মত কাঠ নিজের দেশে সংগ্রহ করতে পারে না। বছরে নিজের প্রয়োজনে তাকে প্রায় ৮০ কোটি টাকার কাঠ আমদানী করতে হয়। মোটকথা থাইল্যাণ্ড তার বনভূমির মূল্যবান অংশের ২৫/৩০ শতাংশ ও ফিলিপনস্ তার বনাঞ্চলের আরও বৃহত্তর শতাংশ খুইয়ে ব'সে আছে।

এই সূত্রে একজন বিশেষজ্ঞের একটি মূল্যবান কথা স্মরণ করা যায়, তিনি বলেছেন, "পৃথিবীতে যারা সবচেয়ে গরীব তারা অবস্থার চাপে এমন কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে যা তাদেরই ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ ডেকে আনছে।"

॥ সংরক্ষণ কি সম্ভব? ॥

এখন তৃতীয় বিশ্বের অনেকগুলি দেশের হাল একই রকম। তারা যদি ক্রমাগত জনসংখ্যা বাড়িয়ে চলতে থাকে তাহলে কোন প্রকল্পেই তারা উন্নতির মুখ দেখতে পাবে না। বৈদেশিক সাহায্য সাময়িক কয়েক জনের মুখের গ্রাস যোগাতে পারে মাত্র, তার বেশি স্থায়ী কোনো কাজে লাগবে না। অন্য দিকে দেশের একমাত্র সম্পদ বনাঞ্চল যা আছে সেগুলি কমতে থাকবে। শেষে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যদি কিছু কিছু সবুজের দর্শন মেলে ত ভাগ্যের কথা।

সেই জমিতে যারা বাস করে সেই অধিবাসীদের দশা কি হবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানিরা শুধু একটি কথাই বলেন যে, আফ্রিকায় সহেল অঞ্চলের লোকেদের যে অবস্থা হয়েছে এদেরও তাই হবে। একদিকে দুর্ভিক্ষ অন্যদিকে ভূমি রুক্ষ হতে হতে স্বল্প বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দেশকে ক্রমে মরুভূমিতে পরিণত করে তুলবে। এশিয়ার কতকগুলি দেশ বিশেষ ভারতবর্ষ এবং ওদিকে আফ্রিকা প্রভৃতি দরিদ্র

এবং উন্নয়নকামী দেশগুলি সম্পর্কে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী অনেকেই করেছেন।

য়ুরোপ ও উত্তর আমেরিকার কথা স্বতন্ত্র। তারা অনেক আগেই সতর্ক হয়েছে এবং বন সংরক্ষণে বহু কার্যকরী নীতি প্রণয়ন করে সে-গুলিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করে আসছে। সংরক্ষণ ব্যাপারে যে দুর্নীতি আমাদের দেশে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে সেই সব দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করার যথেষ্ট ব্যবস্থা তারা নিয়েছে। এই দিকে কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি থাকায় বিধি-নিয়মের ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়লে সেগুলিকে দ্রুত সংশোধন করা সম্ভব হয়। বিশ্বস্ত কর্মী নিয়োগ করা ঐ সব দেশে সম্ভব। সেই সঙ্গে বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, টিম্বার হোক, প্লাইউড হোক আর কাগজই হোক এই সব উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যাদের নির্ভর করতে হয় কাঠের উপর এবং যাদের প্রয়োজন অরণ্যের, তাদেরও সরকার বিমুখ করে না। তাদের সংযত রাখতে হয় যাতে তারা অরণ্যকে ধ্বংস করতে না পারে।

সংরক্ষণ ছাড়া বনাঞ্চল বর্দ্ধিত করা ও উন্নত মানের বৃক্ষরোপন ব্যাপারে ওখানে নিয়মিত চেষ্টা চলছে। বন-বিভাগের বৃক্ষ সম্পর্কে অবিচ্ছিন্ন গবেষণা চলছে এবং তার ফলেই এমন সব বৃক্ষের সন্ধান পাওয়া গেছে যাকে আদর্শ বৃক্ষ বলা যায়। যেগুলি দ্রুত বড় হতে পারে—দৃঢ়তায় শাল-সেগুনের সমকক্ষ হতে পারে আবার কাগজ তৈরির শ্রেষ্ঠ উপাদানও হতে পারে। এমন অনেক গাছের সন্ধান সত্যিই পাওয়া গেছে।

অন্য দেশের পক্ষে সংরক্ষণ বা বনসৃজন খুব সহজ কাজ নয়। একজন বনবিভাগীয় মালয়েশিয়ান অফিসার বলেছিলেন, "আমাদের দেশের দামী গাছ যে হার্ডউড সেই গাছ সৃজন করা খুব কঠিন কেননা একটি গাছ বড় হয়ে সারবান হতে সময় লাগে ৬০।৮০ বৎসর। এত দিন কিসের ভরসায় আমাদের চলবে? কোন ব্যাঙ্ক আমাদের এই দীর্ঘদিনের মেয়াদে টাকা ধার দেবে?

কথাটা সত্যি। ভবিষ্যতে ঐ ধরনের কাঠ হয়ত বা দুষ্প্রাপ্য হবে

বা লোকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। অবশ্য সেই কাঠের বদলে অনেক প্রতিকল্প সিনথেটিক দ্রব্য এখনই লোকের হাতের কাছে এসে গেছে। যদিও প্লাই-উড কাগজ এবং প্লাষ্টিকের আর বিকল্প কিছু হবে কি না কে বলবে।

য়ুরোপ ও উত্তর আমেরিকার বন সম্পদ রক্ষার ঐ দ্রুত পদক্ষেপকে পৃথিবীর সব মানুষই স্বাগত জানাবে। তাদের সাফল্যের একটা প্রমাণ হল, ঐ সব দেশে এক শতক পূর্বে "গাছ কাটো আর জমি বাড়াও" এই শ্লোগানের ফলে প্রচুর অরণ্য ধ্বংস হয়েছিল। তা ছাড়া উন্নত মানের শিল্পের উজ্জীবনের জন্য তাদের অরণ্যের কাঠের প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে কিন্তু সংরক্ষণের নানা কার্যকরী ব্যবস্থার ফলে এবং বন-বিভাগের নানা গবেষণাজাত উন্নত মানের বৃক্ষ সৃজনের ফলে ওসব দেশে অরণ্য ভূমির আয়তন ১০০ বছর আগে যা ছিল এখন তার চেয়ে বেশিই বলতে হবে। তবে নূতন নাগরিকদের বসবাসের জন্য ছোট ছোট বনভূমি কেটে সাফ করে বসত যে তৈরী হচ্ছে তা আমরা দেখে এসেছি।

সমস্যা বৃহৎ হল আমাদের মত দরিদ্র এবং উন্নয়নকামী দেশে যেখানে জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন হারে যে ৩০।৩৩ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণিত হয়ে যাচ্ছে। সরকার বনসৃজন বা বন সংরক্ষণ করছেন বলেন কিন্তু আমলা ও কর্মচারীরা কতটা আন্তরিক ভাবে কাজ করেন সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহের অবকাশ আছে এবং সেখানে মুনাফা-লোভীর ও সুযোগ সন্ধানী টিম্বার মার্চেণ্ট ও লুব্ধ ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম চালানো এক দুঃসাধ্য কাজ। আর যদি কিছু বনসৃজন হয় তাও ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপে কোন কাজে লাগছে না।

আর যেখানে সরকার নিজেই অরণ্য বিনষ্টির কাজে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন সেখানে সাধারণ মানুষের নীরব দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না। যেমন আমাদের এই রাজ্যে কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে কল্যাণীতে এক উপনগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা হয় এবং সেইটি

কার্যে পরিণত করতে এক নিবিড় শালবনকে নিশ্চিহ্ন করা হল। যদি প্রশ্ন করা যায় কল্যাণীতে উপনগরী সৃষ্টি করা হল কেন? উত্তরে বলা হবে, কলকাতাকে বাঁচাতে—কলকাতার জন-বিস্ফোরণের চাপ লঘু করতে। কিন্তু এতদিনেও এই কল্পিত সুফল পাওয়া যায় নি। জনসংখ্যার ঘনত্বের লাঘব হয়নি একতিলও।

ঠিক এমনি আর একটি কারণে অরণ্য ভূমিকে উৎখাত করে ফ্যাক্টরী বসানো হলো। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে নির্মিত হল দুর্গাপুর স্টিল কারখানা। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠান আজও লাভজনক হতে পারল না। তার লোকসানের বোঝা সরকার তথা জনসাধারণ বহন করছে। সরকার বলবেন সেই একই কথা—'তবুও এর দ্বারা বহু বেকারকে কর্মে নিয়োগ করা হয়েছে ত।'

আরও উদাহরণ আছে, যেমন, সল্ট লেক (salt lake city) শহর যার কথা পূর্বে বলেছি। এখানে প্রাকৃতিক জলাশয় ও অরণ্যের পরিবেশ অদৃশ্য হয়ে গজিয়ে উঠেছে জনবসতি পূর্ণ এক উপনগরী, স্টেডিয়াম ইত্যাদি। এদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় আরো উপনগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনাও আছে।

কলকাতার উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত জল-জঙ্গল মাঠ ও জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগ লুপ্ত হয়ে মানুষের বসত গড়ে উঠেছে। জনসংখ্যা বিপুল হারে বাড়লে আর সবাই যদি শহরবাসী হতে চায় তাহলে এ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। তবে আশার কথা পশ্চিমবঙ্গে বন বিভাগের অনেক উল্লেখযোগ্য তৎপরতা জানবার সুযোগ হয়েছিল। তাই বলতে হয় বনসৃজন কর্মেও এঁরা অনেগুলি জেলায় যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছেন।

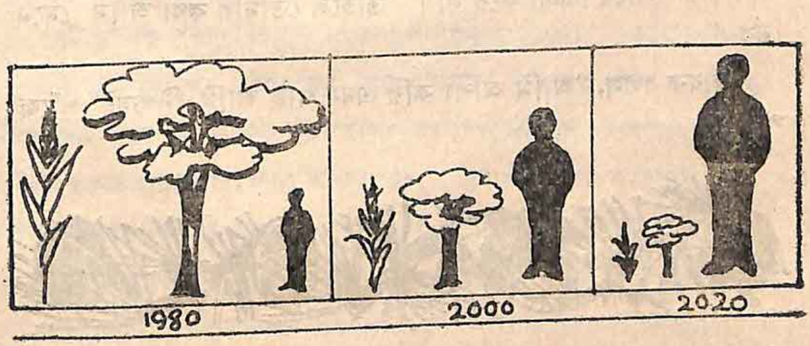
জনসংখ্যার চাপে নিষ্পেষিত কলকাতা জ্ঞানশূন্যের মত দিগ্-বিদিকে প্রসারিত করছে নিজেকে—এর পরিণাম সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ পর্যন্ত নেই কারও।

বিদেশীরা ক্ষণকালের দেখা কলকাতাকে দেখে যতই উচ্ছসিত প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করুন না কেন। বেঁচে থাকার সংগ্রামের দুঃসহ

যন্ত্রণায় জর্জরিত আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কি রেখে যাব? সুজলা সুফলা পৃথিবীর কতটুকু অংশ পাবে তারা?

The earth has enough for every man's needs,
But not for every man's greed.

—Mahatma Gandhi



॥ বৃক্ষলতা ওষধিরূপে ॥

The Sandal tree as if to prove
How Sweet to conquer Hate, Love
Perfumes the axe that lays it low.
—Rabinbranath Tagore

চন্দন বৃক্ষ তার কাণ্ডছেদনকারী কুঠারকেও ভালবাসা দিয়ে সুরভিত করে দেয়—কবির এই অপূর্ব সুন্দর উক্তির তুলনা নেই।

বৃক্ষলতা থেকে ভারতে আয়ুর্বেদ মতে সর্বাধিক ঔষধ তৈরি হয়। এর সঙ্গে কিছু ধাতব ও কিছু আকরিক উপাদান মিশ্রিত হয়—কোথাও অনুপান হিসাবে উদ্ভিজ্জ দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব হতে পৃথিবীতে চিকিৎসা শাস্ত্রের সূত্রপাত হওয়ার প্রাথমিক যুগে আমাদের দেশে আয়ুর্বেদের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। বৃক্ষলতা সম্পর্কে চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ ঋষিদের ধারণা ছিল। পৃথিবীর যাবতীয় বৃক্ষলতা মানবদেহে ভাল কিম্বা মন্দ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ সম্বন্ধে জাতকের একটি সুন্দর গল্প উদ্ধৃত করতে চাই।

শিষ্য জীবক গুরুর কথায় কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করতে রাজী নয় যে, পৃথিবীর যে কোনো উদ্ভিদের মধ্যে এমন শক্তি আছে যে মনুষ্য-শরীরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। গুরুদেব তখন তাকে বলেন, "আচ্ছা জীবক, তুমি যদি এমন একটি উদ্ভিদ আমায় দেখাতে পার যা আমাদের শরীরে ক্রিয়া করে না। তাহলে তোমার কথা আমি মেনে নেব।"

জীবক বলল, "আমি আশা করি এমন গাছ আমি নিশ্চয়ই খুঁজে পাব।"



গুরু বললেন, "বেশ, আমি তোমাকে এক মাস সময় দিচ্ছি। এই সময়ের মধ্যে তোমাকে সেরকম একটি গাছ আনতে হবে।"

জীবক নানা বৃক্ষলতা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু দিনের পর দিন বহু উদ্ভিদ নিয়ে যত পরীক্ষা করে ততই সে নিরাশ হয়ে পড়ে। তার আদর্শ উদ্ভিদ কিছুতেই খুঁজে পায় না। এদিকে একমাস প্রায় অতিবাহিত। একদিন মাত্র বাকী আছে। সে উন্মত্তের মত এক গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল। এখানে নানা ভেষজের গুণাগুণ নিজদেহে পরীক্ষা করতে করতে সে হঠাৎ চৈতন্যহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এমন সময় সেই বনমধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব যাচ্ছিলেন। তিনি জীবকের ঐ অবস্থা দেখে দয়া পরবশ হয়ে তাকে কিঞ্চিত সুস্থ করে তার গুরুর কাছে নিয়ে গেলেন। গুরুদেবকে তিনি বললেন "একে কী এমন দুঃসাধ্য কাজে পাঠিয়েছেন, ও যে মারা যেতে বসেছিল।"

বুদ্ধদেবের চরণবন্দনা করে ভিষগাচার্য বললেন, "প্রভু, ওকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি একটি উদ্ভিদ আনতে বলেছিলাম যার কোনো দোষ বা গুণ নেই। ওর যে এমন গুরুতর অবস্থা হবে তা আমি কল্পনা করিনি।"

তারপর শিষ্য জীবককে শুশ্রূষায় সুস্থ করে গুরু বললেন, "তুমি কি তোমার আদর্শ উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছ?"

গুরুকে প্রণাম করে জীবক বলল, "না, প্রভু, সে উদ্ভিদ আমি পাইনি যা মানবদেহে কোনো ক্রিয়া করে না। আপনি যা বলেছেন, তাই সত্য। আমার আচরণের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।"

এই জীবক পরবর্তীকালে একজন খ্যাতনামা বৈদ্যাচার্য হয়েছিলেন।

বিভিন্ন রোগের উপশমের জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদের ব্যাপক প্রচলন ছিল সেই যুগে। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিও উদ্ভিজ্জ ভেষজের দ্বারা নিরাময় হত পুরাকালে এবং আজও হয়। তার প্রমাণ আয়ুর্বেদ মতে ঔষধ প্রস্তুত ও নানা ভেষজের গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আগ্রহী হয়েছেন এবং দেশে ১৯টি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ঔষধ প্রস্তুত ব্যাপারে এখন বর্তমান উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

আমরা আমাদের সচরাচর ব্যবহারের জন্য কয়েকটি ঔষধের নাম জানি যেমন, তুলসী পাতার রস ও বাসক পাতা ও তার ছাল সিদ্ধ জল সর্দিজ্বরের ঔষধ। চিরেতা ক্রিমির ঔষধ। কালমেঘ আর কুরচি পেটের অসুখ ও লিভারের পক্ষে উপকারী। সিনকোনা গাছ থেকে তৈরি কুইনাইনকে ম্যালেরিয়ার একমাত্র প্রতিষেধক বলা হয়। এরূপ আরও অনেক ঔষধ আছে যার উৎস একমাত্র বৃক্ষ। বৃক্ষ থেকে আধুনিক বিজ্ঞান অনেক রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন করছে, যেমন অ্যাসেটিক এসিড, মেথানল, মিথাইল এসিটোন প্রভৃতি। লিগনিন নামক একপ্রকার বস্তু কাঠ থেকে পাওয়া গেছে যা থেকে অসংখ্য কেমিক্যাল তৈরি হয়। এর কতকগুলি থেকে রেজিন, পেইন্ট ও বার্নিশ জাতীয় দ্রব্য প্রস্তুত হচ্ছে। আবার কতকগুলি থেকে এমন আশ্চর্য গুণসম্পন্ন ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে যা বাতব্যাধি (Arthritis) এবং মাইগ্রেন (Migrain) নামক যন্ত্রণাদায়ক অসুখে ইন্দ্রজালের মত কাজ করে। মর্ফিন (Morphin) ও ডিজিটক্সিন (Digitoxin) প্রভৃতি অনেক ঔষধ উদ্ভিদ জগতের বিশেষ অবদান হিসাবে আমরা লাভ করেছি।

আধুনিক এলোপ্যাথ ডাক্তারেরা অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে উদ্ভিজ্জাত ঔষধও প্রচুর ব্যবহার করেন। বেলেডোনা, ইপিকাক, অ্যাকোনাইট ইত্যাদি বহু ঔষধ হোমিওপ্যাথি মতেও বহুল ব্যবহৃত।

পেনিসিলিন এবং নানা রকমের অ্যান্টিবায়োটিক যথা, ক্লোরো-মাইসেটিন জাতীয় ঔষধ লক্ষ লক্ষ লোকের যে জীবন রক্ষা করছে তা বলাই বাহুল্য। এগুলি ছত্রাক জাতীয় উৎস থেকে তৈরি হয়। অর্থাৎ এসব জীবাণুনাশক এবং উদ্ভিদজাত। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, স্বাস্থ্যরক্ষার এবং রোগ মুক্তির জন্য আমাদের উদ্ভিদ জগতের উপর নির্ভর না করে উপায় নেই। কী পরিমাণ উদ্ভিদজাত ঔষধ ডাক্তারেরা রোগীদের ব্যবস্থাপত্রে লিখে দেন তার একটি সমীক্ষা করে-ছিলেন মার্গারেট ক্রেগ নামক এক বিশেষজ্ঞা। তাঁর সমীক্ষার ফলে আমরা জানতে পারি যে, ডাক্তারদের ব্যবস্থাপত্রে শুধুমাত্র উদ্ভিদজগৎ

থেকে তৈরি ঔষধের পরিমাণ ৪৭ শতাংশ। এই সিন্‌থেটিকের যুগে এটি বিস্ময়জনক সন্দেহ নেই।

পূর্ব-কথিত জাতকের গল্পের নায়ক জীবক যে অসংখ্য প্রকার উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করেছিল তা নিশ্চয়ই তার নিজের দেহের উপর। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র হলে প্রত্যেক উদ্ভিদের কোন না কোনো ক্রিয়া শরীরের উপরে থাকবেই। কোনটি সাময়িক, কোনটি স্থায়ী। কোনটি হিতকর কোনোটি আবার ক্ষতিকরও হতে পারে। এমনকি কোনো উদ্ভিদের বিষক্রিয়াও দেখা গেছে যার ফলে মৃত্যু ঘটাও আশ্চর্য্য নয়। আমরা জানি ধুতুরার ফল ও বীজ বিষতুল্য। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের প্রাণদণ্ড হয় হেমলক (এক প্রকার উদ্ভিদ) নির্য্যাস পান করিয়ে।

একটি ফুলের সন্ধান পাওয়া গেছে যেটির নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রণয়কুসুম' (Passion flower), দেখতে অপূর্ব মনোরম টুকটুকে রক্তবর্ণ বড় বড় পাপড়ি বন আলো করে ফুটে থাকে। এটি জীবদেহ-মধ্যে গেলে বিষের মত কাজ করে। এর মধ্যে সায়ানাইড (Cyanide) জাতীয় যৌগ পদার্থ আছে। লাটিন ভাষায় একে বলা হয় Passiflora Coccinea। এর মারাত্মক গুণ বলা হয় আত্মরক্ষার জন্য। ব্রাজিলের গভীর অরণ্যে এই ফুল ফুটে থাকতে দেখা যায়।

আবার চীন দেশের অরণ্যের ধারে ঝোপ ঝাড়ে একটি গাছ আছে যার আশ্চর্য গুণ মানুষকে নীরোগ করা এবং চির যৌবন দান করা। এটির নাম গিনসেন, মাটি থেকে বড় জোর ৩।৪ হাত উঁচু হয়। আমাদের দেশে শতমূলী অশ্বগন্ধা জাতীয় বহু উদ্ভিদ আছে যা আমাদের দেহের পুষ্টিসাধন করে। আবার উদ্ভিজ্জ আফিং (Opium) বা মরফিন (Morphine) বেশীমাত্রা পড়লে মারাত্মক কাজ করে।

॥ অরণ্যের অন্যান্য দান ॥

প্রকৃতির রাজ্যে কতকগুলি বৃক্ষ আছে যাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখলে বিস্মিত হতে হয়। নিপা (Nipa) নামক এক রকম তাল গাছ হয় ম্যাংগ্রোভের ঝোপের মধ্যে যেখানকার মাটি আর্দ্র থাকে।

আমাদের সুপরিচিত নারকেল গাছের বোধ হয় তুলনা হয় না। এর কাণ্ড জ্বালানি ছাড়া অনেক কাজে লাগে। পাতা দিয়ে ঘর ছাওয়া ইত্যাদি বহু কাজে, তারপর ফলের ত তুলনা হয় না। ফলের মধ্যে পুষ্টিকর শাঁশ, খোলা বা মালা ও তার উপরের ছোবড়া প্রত্যেকটিই বিশেষ কাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় !

তৃণজাতীয় উদ্ভিদ আমাদের বহু প্রয়োজনে লাগে। উলুজাতীয় তৃণ গবাদির ভক্ষ্য এবং এগুলি কাগজ তৈরির উপাদান। অবশ্য এখন কাগজের জন্য বৃক্ষই বেশী ব্যবহৃত হয় !

রোশা তৃণ (Rosa grass) ও লেবু ঘাস (Lemon grass) এগুলি নিষ্পেষিত করলে যে একপ্রকার তেল পাওয়া যায় সেগুলি গন্ধ দ্রব্য হিসাবে মূল্যবান। পূর্বে সোফিয়া ও মোতিয়া ঘাস থেকে গন্ধ তৈল উৎপন্ন হত এবং তা বোম্বাই থেকে য়ুরোপের নানা দেশে বহু মূল্যে রপ্তানি করা হত।

গন্ধ তৈল বলতে গেলে যেটির নাম সর্ব্বাগ্রে করতে হয় সে হল চন্দন তৈল। চন্দন কাঠ (Sandal wood) থেকে নানা প্রক্রিয়ায় এই তৈল নিষ্কাশিত করা হয়। চন্দন কাঠ পাথরে ঘষে যে একপ্রকার প্রায়-তরল লেই জাতীয় পদার্থ পাওয়া তা দেব পূজায় লাগে। তাছাড়া প্রসাধন হিসাবে এবং কতকগুলি চর্মরোগে প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চন্দন বৃক্ষ কোথাও হয় না একমাত্র ভারতের মহীশূর ছাড়া। মহীশূর সরকার চন্দন কাঠের ব্যবহার ও তা থেকে তৈল উৎপাদন একটি জাতীয় শিল্প হিসাবে নিজেদের তত্বাবধানে পরিচালিত করেন। চন্দন তৈল যে কোনপ্রকার সুগন্ধি প্রসাধন দ্রব্যে মিশ্রিত করা হয়। এতে সুগন্ধের যেমন মান উন্নত হয় তেমনি গন্ধের স্থায়িত্ব বর্ধন করার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। তাই পৃথিবীর সব দেশেই চন্দন তৈলের চাহিদা প্রচুর।

চন্দন তৈল অপেক্ষা কিছু নিম্ন মানের আর এক প্রকার তৈল আছে যাকে বলে সিডার উড তৈল (Cider wood oil)। চন্দনের গন্ধের মত এর কৌলিন্য নেই বটে কিন্তু তথাপি সিডার উড অয়েলেরও

প্রচুর চাহিদা আছে। ইহা ceder নামক এক প্রকার সরল বর্গীয় গাছের কাঠ থেকে হয়ে থাকে। দেওদার ও পাইন থেকেও রেজিনের মত বা আলকাতরার মত (tarry substance) দ্রব্য পাওয়া যায়। দামে সুলভ কিন্তু প্রচুর ব্যবহার আছে। এক প্রকার পাইন কাঠ থেকে আমরা পাই (Turpentine) তার্পিন তেল।

আর একটি গন্ধতৈল প্রকৃতি আমাদের উপহার দিয়েছেন সেটি ও প্রচুর ব্যবহৃত হয়। তার নাম আগর আগর। এই তৈলের উৎস যে আগর গাছ সেটি জন্মায় কতকগুলি বিশেষ স্থানে, যথা আসাম ভূটান এবং খাসিয়া পাহাড়ের স্থানে স্থানে। তা ছাড়া ব্রহ্মদেশে কোন কোন স্থানেও এটি জন্মাতে দেখা যায়। কাঠ থেকে ঐ তৈল নিষ্কাষিত হবার সময় একটি ঘন তরল দ্রব্য পাওয়া যায় প্রতিকল্প হিসাবে। সেটিকে তার ঘনীভূত তীব্র সুগন্ধের জন্য বলা হয় আগর আতর। এটি বেশ মূল্যবান। চোলাই করার সময় যে রেজিন জাতীয় অংশটি তলায় পড়ে থাকে তাকে ঘন অবস্থায় পোড়ালে এক অপূর্ব সুগন্ধ ধোঁয়া নির্গত হয়। সেইটি থেকেই যত আগরবাতির ধূপ তৈরি করা হয়। এটি সরু কাঠির আকারে আমরা ঘরের মধ্যে জ্বেলে দিয়ে তার সুগন্ধ ধোঁয়া উপভোগ করি।

সরল বর্গীয় একপ্রকার পাইন গাছ চোলাই করে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি হয় তার নাম তার্পিন তৈল (Turpentine)।

কোন কোন সিডার কাঠ বা দেওদার কাঠ থেকে একটা ঘন কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ পাওয়া যায় সেটির ব্যবহার আবার চর্মরোগের ঔষধ হিসাবে। মাছি ও পোকা কামড়ালে তা লাগানো যায় এবং সেটি বাতের উপসর্গেও উপকারী।

কাঠ থেকে যে কত জিনিস পাওয়া যায় তার কিছু কিছু অন্যত্র বলেছি তবে কাঠ পুড়িয়ে যে কয়লা হয় তারও চাহিদা কম নয়। এই কাঠ কয়লা তৈরি করার অনেক রকম পদ্ধতি আছে।

'দ্য হাংরী ওয়াল'ড' নামক পুস্তকে রে ভাইকার একটি বিস্ময়কর তথ্য জানিয়েছেন। সেটি হল, সমুদ্রজাত একপ্রকার শৈবাল নিয়ে।

এমন জিনিস যাকে মানুষ আবর্জনা হিসাবে এতদিন বর্জন করে এসেছে বা পুড়িয়ে ফেলেছে, সেই রকম একটি জিনিসের কথা বলছি। এটি হল সমুদ্রের তীরে জাত এক প্রকার শেওলা জাতীয় আগাছা, যাকে sea weed বলা হয়। এই সমুদ্র-শৈবাল যে কত কাজে লাগতে পারে সম্প্রতি তা প্রমাণিত হয়েছে। স্কটল্যাণ্ডের সমুদ্রতীর থেকে এইগুলি সংগ্রহ করে স্তূপাকারে রাখা হয়। অ্যাল-জিনেট নামে একটি কোম্পানী ঐ বস্তুটি তাদের দুটি কারখানায় ব্যবহার করে এবং তার পরিমাণ বিপুল, বছরে ২০০.০০০ টন। ঐ অ্যালজিকে চূর্ণ করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দ্রবণ ইত্যাদি বহু প্রক্রিয়ার পর এমন একটি বস্তুতে পরিণত করা হয় যা এখন বহু নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয় যেমন—টুথপেষ্টের সঙ্গে, সসেজের সঙ্গে, এমন কি আইসক্রীমের সঙ্গে এবং আরও অনেক কিছুর সঙ্গে।

বাবলা বা বাবুল গাছে এক রকম শুঁটি (Babul pod) হয়। তা থেকে এবং বাবলা গাছের আঠা থেকে তৈরি হয় একেশিয়া (Acacia Arabica)। এই গাছ আবার রং পাকা করার (tanning) কাজে ব্যবহৃত হয় তার কারণ এর মধ্যে tanin নামে এক জাতীয় কষ প্রচুর পরিমাণে আছে।

বনের আর দুটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বাঁশ আর বেত। এদের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা এত রকম যে বলে শেষ করা যাবে না।

রেশম তৈরির জন্য যে গুটি (cocoon) সে ত গাছের পাতা খেয়ে বড় হতে থাকে এবং সেই গুটি থেকে আমরা পাই উজ্জ্বল বর্ণের মূল্য-বান রেশম। তুঁত গাছের (Mulberry) পাতা থেকে যে রেশমে রূপান্তরিত হওয়া এটি জীব বিজ্ঞানের এলাকায় যতই পড়ুক না কেন, তবু বলতে হবে জীব বিজ্ঞান দাঁড়াবার স্থান পেয়েছে উদ্ভিদ তত্ত্বের ভিত্তির উপর, তাই নয় কি?

গর্জন নামে এক প্রকার গাছ আছে তা থেকে পাওয়া যায় গর্জন তৈল। এই তৈলের গুণ হল প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে কীট-পোকার কবল

থেকে রক্ষা করা এবং তাছাড়া এটির প্রচুর ব্যবহার হয় বার্ণিসের কাজে। মাটির প্রতিমায় রঙের কাজ হয়ে গেলে গর্জন তৈল প্রলেপ দেওয়া হয় তার চাকচিক্য বাড়াবার জন্য।

এর পরে আর একটি দ্রব্যের নাম করতে হয় যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় বাল্যকাল থেকে। এটি হল রবার। রবারের বল বা পুতুল না নিয়ে কোনো শিশুর বাল্যকাল কেটেছে কি? এই রবার একপ্রকার গাছের আঠা থেকে তৈরি। রবার গাছ সর্বত্র হয় না কিন্তু। হিমালয়ের নিকটবর্তী অঞ্চল, নেপাল, আসাম, খাসিয়া পাহাড় গৌহাটির অন্তর্গত প্রভৃতি স্থানে রবার গাছ জন্মে। গাছ বড় হলে তার ত্বক চিরে চিরে দিলে একপ্রকার আঠা নির্গত হয়—সেই আঠাই রবার। অবশ্য আমাদের ব্যবহার উপযোগী করতে তাকে অনেকগুলি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বর্তমানে রবারের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে এবং এখন প্লাষ্টিকের মত কয়েকটি পদার্থের যৌগ হিসাবে কৃত্রিম রবারও প্রস্তুত হচ্ছে।

পৃথিবীতে কর্পূরের চাহিদা কি কম? এই কর্পূর আমরা পাই অরণ্যের এক বৃক্ষ থেকে। তবে কর্পূর বৃক্ষ বেশির ভাগ জন্মায় ফরমোজা দ্বীপে, জাপানে ও চীন দেশে। সম্প্রতি এটি শ্রীলঙ্কা, ভারত ও ব্রহ্ম দেশের জঙ্গলে তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। তবে সেটা আসল কর্পূর গাছ (Camphor tree) নয়, তার প্রতিকল্প আর একটি গাছ যার নাম Cinemonum Camphora।

আর একটি ভারতের একচেটিয়া ফসল যা বহুল পরিমাণে য়ুরোপের নানা দেশে রপ্তানি করা হয় তা হল হরিতকী। ট্যানিন এ্যাসিডের জন্য হরিতকী অতীব মূল্যবান।

হয়ত এমনও অনেক গাছ গাছড়া আছে যা এখনও অজ্ঞাত বা উপেক্ষিত হয়ে আছে। কিন্তু সেগুলি যে উপযুক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষায় মানুষের কল্যাণকর প্রয়োজনীয় বস্তুর তালিকায় বিশেষ স্থান পাবে না এ কথা কেউ বলতে পারে কি?

॥ মরুভূমির জন্মকথা ॥

এই যে রে মরুস্থান
দাবদগ্ধ ধরাতল
এখানেই ছিল পুষ্পবন
একদিন ছিল তার
শ্যামল যৌবনভার
ছিল তার দক্ষিণ পবন ॥
—রবীন্দ্রনাথ

মরুভূমির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ক'জনের আছে জানি না, আমার অবশ্য নেই। তবে আমি এমন একজনকে জানি যিনি মরুভূমির উপর একা একরাত্রি কাটিয়ে এসেছেন।

তিনি যাচ্ছিলেন সাধুর বেশে, গায়ে একটা গেঞ্জির মত ফতুয়া। পরনে গৈরিক, মাথায় কাপড়ের টুপি, গায়ে একটা মোটা চাদর মাত্র। পায়ে হয়ত স্যাণ্ডাল একজোড়া ছিল। সময়টা অপরাহ্ন, বালির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। একটু পরেই কিন্তু আকাশের পশ্চিমে সিঁদুর ছড়িয়ে অন্ধকার নেমে এল। এবার তাঁর কথাতেই বলি—"এর জন্যে হয়ত আমি প্রস্তুত ছিলাম না। এখন দিক্ নির্ণয় করার কোনো উপায় রইল না। তা না থাক, ভাবলুম যতক্ষণ পারি হাঁটতে থাকব। বালির উপর দিয়ে হাঁটা কষ্টকর, কিন্তু তার উপরেও যে বাধা আসবে তা ভাবতে পারিনি। হঠাৎ ঝড় উঠল—ঝড়ে বালুকণাগুলো তীরের মত ফুটছে গায়ে ও মুখে, দিগন্ত এখন বিলীয়মান। আশ্রয় নেবার কোনো বস্তু ত্রিসীমানায় নেই। ভাবছি এবার কি করা যায়।



একমাত্র উপায় যা মনে হল তা হচ্ছে শুয়ে পড়া, চাদরটা সর্বাঙ্গে ভাল করে জড়িয়ে শুয়ে পড়লুম বালুশয্যায়। এখন ঝাপ্‌টায় বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না। মাথা মুখ সর্বাঙ্গ ঢাকা···কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙ্গতে ওঠবার চেষ্টা করি কিন্তু ওঠা দুঃসাধ্য মনে হল। মোটা এক বালির স্তূপের মধ্যে যেন কবরস্থ হয়েছি—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়নি...”

এই মরুঅঞ্চল আমাদের দেশেরই। রাজস্থানের থর মরুর একাংশ।

পৃথিবীর সমস্ত দেশে ও মহাদেশে এক বা একাধিক মরুভূমি থাকবেই। আফ্রিকার সাহারাকে বলা হয় সর্ববৃহৎ তার প্রকাণ্ড আয়তনের জন্যে। এই আয়তন কিন্তু তার নিজেরই রচনা। বিশেষজ্ঞরা বলেন, প্রতি বৎসর সাহারা ৫০ মাইল করে অগ্রসর হচ্ছে। গত অর্ধশতকে সে প্রায় সাড়ে ছ'লক্ষ স্কোয়ার কিলোমিটার ভূমি গ্রাস করে নিজের আয়তন বর্ধিত করেছে।

চিলিতে আছে আতাকোমা মরু যার দাবদহনে শত শত স্কোয়ার কিঃ মিঃ ভূমি রুক্ষ বালুস্তূপে পরিণত হয়েছে। চীনে সাইবেরিয়ায়, ভারতে, দক্ষিণ আমেরিকায়, আর্জেন্টিনায় ইত্যাদি দেশে যে সব মরুভূমি আছে তাদের আয়তন একত্র করে যোগ দিলে বিশেষজ্ঞদের হিসাবে পৃথিবীর সমগ্র ভূ-ভাগের মোট আয়তনের ৪৩ শতাংশের বেশি হবে ত কম নয়। সব চেয়ে ভয়ের কথা হল এই যে, এরা কেউই আয়তনে সংকুচিত হচ্ছে না। বরং স্ফীতকায় হয়ে উঠছে যার ফলে ধরিত্রীর সব দেশের চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এদের শ্রীবৃদ্ধিতে মানুষের যথেষ্ট ভয় এবং উপরন্তু এই বৃদ্ধি প্রতিহত করার শক্তি ও উপায় এখনও মানুষের করায়ত্ত হয়নি। তাই এরা যে ভবিষ্যতে মৃত্যুর বিভীষিকা হয়ে উঠবে না তার নিশ্চয়তা কোথা?

॥ অতীতের রূপ ॥

সাহারার কথাই বলি, পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ মরুভূমি। যার

আয়তন ৯০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। ছবিতে কেমন সুন্দর দেখতে। যেন ঢেউ-খেলানো বালির সমুদ্র। কূল কিনারা নেই—যতদূর দৃষ্টিসীমা যায় ততদূর পর্যন্ত প্রসারিত। মাঝে মাঝে তার তরঙ্গায়িত রূপকে মনে হয় মানুষের হাতে তৈরি যেন আরকিটেকচার। সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গ হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে জমাট হয়ে গেছে। এই দিগন্ত বিস্তৃত বালুকারাশি প্রাণহীন এক ভয়াবহ শূন্যতা নিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছে। ওখানকার বাতাস উত্তপ্ত জলবাষ্পহীন। কোথাও সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। কোথাও এমন স্থান আছে যেখানে দশ বছরে একবারও বৃষ্টি হয় না।

এই নিস্প্রাণ দিগন্তজোড়া মরুক্ষেত্রে কোথাও আবার ছড়িয়ে পড়ে আছে ছোট বড় পাথরের খণ্ড। তার আশেপাশে হয়ত দাঁড়িয়ে আছে তাল জাতীয় এক খর্জুর বৃক্ষ, তারা যেন রচনা করেছে একটি লোভনীয় উদ্যান। এই মরুদ্যানে মাটির দেয়াল তুলে দিয়ে বসত নির্মাণ করেছে মানুষ। বাস করছে হাজার হাজার মানুষ। তাদের একমাত্র সম্বল আর পরম বন্ধু ঐ চতুষ্পদ উট।

এই সাহারা আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল জুড়ে রয়েছে, তার আশেপাশে কয়েকটি দেশ যেমন লিবিয়া ও আলজিরিয়া। এ সব দেশে প্রচুর মানুষের বসবাস। সাহারা এককালে কিন্তু সবুজ বৃক্ষবহুল অরণ্যে ঢাকা ছিল। সেখানে দেখা পাওয়া যেত বন্য পশুর। এমন কি হাতি গণ্ডারও নাকি ছিল। আর ছিল নগর জনপদ। সেই রোমক সভ্যতার সময় এটি সাধারণ অন্য দেশের মতই ভূপৃষ্ঠ অলঙ্কৃত করে বিরাজ করত। কিন্তু সে অনেক আগে। বহু হাজার বছর আগের কথা। বিশেষজ্ঞদের মতে এর রুক্ষমূর্তি দেখা গেছে খৃষ্টপূর্ব বহু শতক আগে। যীশুখৃষ্ট যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন থেকেই এর সবুজ আভরণ মুছে গিয়ে এক ভয়ঙ্কর রুক্ষ মূর্তি উত্তপ্ত বালুকারাশির শুষ্ক আবরণ গায়ে দিয়ে হাহাকার করছে।

ঠিক ঐ একই ইতিহাস ভারতে থর মরুর। একদিন এখানেও জন্মলাভ করেছিল এক বিচিত্র প্রাচীন সভ্যতা। তারপর সে যে কোন

দুর্যোগে চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে গেল তা একমাত্র বিধাতাই জানেন। অতীতের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে হরপ্পা সভ্যতার নামাঙ্কিত অবশেষগুলি শুধু মিউজিয়ামে ও ইতিহাসের পাতায় চিরকালের হয়ে থাকবে। ওখানেও অরণ্য ছিল যার গভীরে ঘুরে বেড়াত হিংস্র শ্বাপদ। স্রোতস্বতী সরস্বতী নদীর নামটি আমরা প্রাচীন লেখায় পাই, কিন্তু তার অবলুপ্তি হয়েছে বহুপূর্বে। সরস্বতীর তীরে তীরে ছিল সভ্য মানুষের জনপদ। চার হাজার বছর অতীতের সেই সভ্যতার অস্থিপঞ্জর আজও ওখানকার মাটির তলায় কিসের আশায় দিন গুণছে কে বলবে ?

মহামতি প্লেটো খেদোক্তি করে এই একই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আমাদের সেই সুকোমল আবাদ যোগ্য উর্বর জমিগুলি কোথায় অদৃশ্য হল জানি না, পড়ে রইল শুধু তার রুক্ষ অস্থি কঙ্কাল।"

গ্রীসের মাটিতে তখন ফসল হয় না। খাদ্য ফসলের অভাবে সারা দেশে হাহাকার। মানুষ হল নীতিভ্রষ্ট এবং তার ফলেই সেই আকাশচুম্বী মানব সফলতার পীঠস্থান গ্রীক সভ্যতার হল শোচনীয় অধঃপতন।

॥ মরু সৃষ্টির রহস্য ॥

মরুভূমি কি বিধাতার সৃষ্টি ?

হয়ত, প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশে একটা কি দুটো মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছিল। হয়ত কোনো সময়ে মহাকাশ থেকে কোনো জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়েছিল। তার প্রচণ্ড সংঘাতে এবং উত্তপ্ত দহনে পৃথিবীর তত্রস্থ উদ্ভিদ জ্বলে পুড়ে গিয়েছিল। সৃষ্টি হয়েছিল রুক্ষ মাটির প্রান্তর—যাকে পরবর্তী কালে মরুভূমি নাম দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু এ ঘটনা মানুষের স্মরণীয় ইতিহাসে ঘটেনি, হতে পারে আরো প্রাচীন এর ইতিহাস। বিশেষজ্ঞদের মতে অধিকাংশ মরুভূমি সৃষ্টি করেছে মানুষ। দুর্ভাগ্য বলতে হবে। কিন্তু অতীব সত্য। কারণটা ওঁরা বলেছেন :

মানুষ যখন অরণ্যচারী পশুমাংসভুক, তখন তার এক ছটাক জমিরও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তারপর কৃষিকর্ম রূপ যাদুমন্ত্রটি যখন তার আয়ত্ত হল, তখন সে জমি চাইল ফসল ফলাবার জন্যে। বলদের শক্তি দিয়ে হাল চালানো তার শেখা হল। জমির চাহিদা বাড়ল। জমির পর আরো জমির প্রয়োজন হল তার। সেই সঙ্গে তার পুত্র কন্যা ও পরিবারের সংখ্যাও দ্রুত গতিতে বাড়ছে। খাওয়ার মুখ বাড়ছে বটে কিন্তু খাটবার মজুরও বাড়ছে ত। চাষ করার আদিম যন্ত্রাদি ক্রমশই উন্নত হতে লাগল। তখন অল্প সময়ে অল্প আয়াসে সে বেশি জমিতে বেশি শস্য ফলাতে লাগল। জমির প্রয়োজন ক্রমেই বাড়ছে তার। ঐ যুগের নতুন হাল ধরা কৃষক সম্প্রদায় একটা জমিতে বার বার একই ফসল ফলায়। তার ফলে ফসল কমতে থাকে। এবং কয়েক শতক পরে দেখা গেল জমিটি অফলা হয়ে গেছে।

কিন্তু নতুন জমি ত আছে। পৃথিবী তখন বিপুলা। চারদিকে তার অপর্য্যাপ্ত জমি। নদনদী পর্বত জলাশয় বাদ দিয়েও অঢেল জমি। কৃষক সম্প্রদায় পুরানোটি ত্যাগ করে ছুটল নতুন জমির দিকে। বন জঙ্গল থাকলে তাকে সাফ করে নিতে কতক্ষণ। সে জমি সাফ করে নেয় এবং তাকে কৃষিযোগ্য করে তোলে। কিন্তু যে ভূখণ্ড সে পরিত্যাগ করে এল তার কি দশা হল? সেখানে ঝোপঝাপ আর মাঝে মাঝে তৃণগুচ্ছ। এইগুলি বুকে নিয়ে সে পড়ে রইল। তার উদ্ভিজ্জ সম্পদের ছিটে ফোঁটা, কাঁটা ঝোপ আর ঘাস, ছাগল গরুতে মুড়িয়ে খেয়ে নিল। প্রখর রোদের খর তাপে মাঠ ফেটে চৌচির হতে থাকে; আবার বর্ষার জল ধারায় তার উপরকার মাটি ধুয়ে যায়। মাটিকে নিয়ে সে জলস্রোত ছোটে নদীর দিকে। বছরের পর বছর এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। কয়েক শতাব্দী পরে এইসব জমি মরুভূমির প্রাথমিক রূপ নেয়। জল ধারায় ধুয়ে ধুয়ে 'ইরোশান' এবং দ্রবণীয় অংশ ধুয়ে গেলে মাটি বালির আকার ধারণ করে। কয়েক হাজার বছর পরে এই জমিকে আর চেনা যাবে না। সমুদয় রুক্ষতা নিয়ে যে রীতিমত একটি মরুভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কালে দেখা

যাবে সে হয়ত গোবী, থর কিম্বা সাহারার মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এগুলি কিন্তু বিজ্ঞানীদের অনুমান নয়—অভিজ্ঞতা।

মনুষ্যসৃষ্ট মরুভূমি নিজেই নিজেকে বর্ধিত করে এটা যেন তার স্বধর্ম। সে আকাশ বাতাসের আবহাওয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, বৃষ্টিপাত সামান্য হল কিম্বা হলই না। অনেক সময় মরুর উপরকার বাতাসের স্তরে হয়ত জলকণা আছে ৮০ শতাংশ তবুও বৃষ্টি নেই। কেন?

মরুর গাত্রস্থ চকচকে বালুর আবরণ অনেকটা আয়নার মত। সৌররশ্মিকে সে প্রতিফলিত করে ফিরিয়ে দেয়। তাই বালুকারাশি খুব তপ্ত হতে পারে না। বৃষ্টিপাতের নিয়ম প্রতিপালিত না হওয়ায় বর্ষণ আর হল না। মরুর রুক্ষতা আরো বাড়তে থাকে।

॥ মরুপ্রায় বা অর্ধমরু ॥

ঠিক মরুভূমি নয় অথচ অফলা জমি যাকে অকেজো বা পতিত (fallow) জমি বলা হয় এগুলি চাষীর কাছে এক সমস্যা। সে হয়ত অনেক আগে এগুলি পরিত্যাগ করেছিল এমন জমি যার ইংরেজি নাম Semi-arid land—সেই রকম জমি পৃথিবীতে কম নেই কিন্তু। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন,এরকম জমির মোট আয়তন ভারতের সমগ্র আবাদযোগ্য জমির প্রায় ৪০ শতাংশ। ভয়ের কারণ ত বটেই যেহেতু এই সব মরুপ্রায় অঞ্চলে জন বসতি ক্রমেই বাড়ছে। যারা বাস করে তারা চাষ করার বহু কসরৎ করে কিন্তু কিছু পায় না। জমি তার উর্বরতা হারিয়ে ফেলেছে। এরকম ঘন বসতিপূর্ণ পতিত জমি আমরা প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাই রাজস্থানের পশ্চিমে। এই রুক্ষ জমিতে কিন্তু মানুষের বসতির সংখ্যা কম নয়। এই সব মানুষ চাষ করতে আসে না বাস করতে আসে। আবার এদের মধ্যে যাযাবর শ্রেণীর লোকও আছে। মানুষ বাসিন্দার সংখ্যা এত বেশি যে হিসাব করলে দেখা যায়—এক স্কোয়ার কিলোমিটার স্থানে বাস করে ৪৮ জন মানুষ।

এই সব জমির রুক্ষতা রোধ করা যাবে কি?

সম্ভবত সরকার কি জনসাধারণ কেউ পারবেন না।

এবার মানুষের আর একটি অজ্ঞতার কথা বলি। আমাদের দেশে নয়—সুদূর দক্ষিণ আমেরিকায়, ব্রেজিলে। অজ্ঞতা ও দুর্বুদ্ধির ফল কী মারাত্মক হতে পারে তারই একটি উদাহরণ।

ব্রেজিলের আকাশ দিয়ে ফ্লাই করতে করতে একবার দেখেছিলাম নীচে সবুজের যেন মোটা কার্পেট পাতা। মাইলের পর মাইল চলে গেছে। সবুজ কার্পেট আর কিছু নয় ঘন অরণ্য সুবিখ্যাত এবং বৃহত্তম অরণ্য যেখানে মূল্যবান কাঠের অফুরান ভাণ্ডার।

সেই অ্যামাজনীয় অরণ্য এতদিনও টিকে আছে শুধু তার দুর্ভেদ্যতার জন্য। কাঁটা ঝোপ আর বিষাক্ত পোকা মাকড় বিছে সেই বনভূমিকে দুস্প্রবেশ্য করে রেখেছে।

কিন্তু এখন অরণ্যের সে সুদিন আর নেই। মানুষ তার উদ্ভাবিত আধুনিক বিদ্যুৎ করাত আর ট্যাংক জাতীয় বাহন নিয়ে সেই অরণ্য উৎখাত করছে। হাইওয়ে তৈরি হয়েছে এবং আরো অনেক সড়ক তৈরি হচ্ছে। এসপাইরিটো স্যাণ্টো নামক সবুজ অরণ্য প্রদেশ এখন বৃক্ষহীন ফাঁকা মাঠের মত বিরাজ করছে। সেখানকার অরণ্য বিহারী পক্ষিকুল যাদের ২০০ শতাধিক বিশেষ প্রজাতি ওখানে ছিল তারা এখন পলাতক। ঐ পাখিই চাষীর মাঠে পোকা মাকড় খেয়ে ফসল ফলাবার সুযোগ করে দিত—সুতরাং সেখানে এখন চাষবাস করাও হয়েছে অসম্ভব। বৃষ্টিপাতের তারতম্য ঘটছে এবং আরো যেটা গুরুতর সেটা হল ওখানকার বিদেশী অধিবাসীদের ক্যান্সার রোগাক্রান্ত হতে শোনা যাচ্ছে।

॥ থর মরুভূমি কি বাড়ছে?॥

কোনো কোনো মহল থেকে বলা হয়, থর আর আকারে বাড়বে না। কিন্তু অন্য সূত্র থেকে শোনা যায়, প্রতি বছরে থর এক থেকে দেড় মাইল করে সবুজ ভূমি গ্রাস করছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে থরকে বা তার বৃদ্ধিকে প্রতিহত করা কি সম্ভব ?

প্রতিষেধক হিসাবে যা বিধান দেওয়া হয়েছে সে প্রায় অসম্ভবের কোঠায় গিয়ে পড়ে। যেমন মরুর উপরস্থ বালি মাটি চেঁচে পুঁচে মাটির নীচে পুঁতে ফেলা হলে কিছু কাজ হতে পারে। কিম্বা লবণাক্ত অংশগুলি জলে ধুয়ে পরিষ্কার করা যেতে পারে। এইভাবে যে নতুন মাটি হল তাতে গাছ বসিয়ে দেখতে হবে সে শিকড় নামিয়ে দাঁড়াতে পারছে কি না। যদি পারে—তাহলে হয়ত মরুর গ্রাস থেকে পার্শ্ববর্তী সবুজ মাটিকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিবেশ বিশেষজ্ঞের কতকগুলি হিতকথা শুনতে হবে যথা—

(১) জমি বিশেষ করে অফলা (arid) জমি দেখে স্থির করতে হবে সেখানে গোচারণ ভূমি হবে না চাষ করা সম্ভব হবে কিম্বা কোনো কিছু না করেই ফেলে রাখতে হবে। অন্ততঃ কয়েক বছরের জন্য।

(২) গবাদি পশুর সংখ্যা জমি অনুপাতে হওয়া চাই।

(৩) চাষ করতে হবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অর্থাৎ রকমারি চাষ। একবার যে ফসল হল পরের বছর অন্য ফসল। দেখতে হবে বর্ষার পরে জমি যেন জলসিক্ত থাকে, শুকিয়ে না যায়।

(৪) বৃক্ষহীন পাহাড় পর্বতে গাছ লাগানো উচিত। এমন কি বালির স্তুপেও গুল্মাদি লাগালে ভাল হয়।

(৫) গোবর পুড়িয়ে না ফেলে সৌর উনুন ব্যবহার করা উচিত।

(৬) জলসেচের পদ্ধতিটি নিখুঁত হওয়া চাই। যতটা শস্যের দরকার তার বেশী চাই না। জল নিকাশের পয়ঃপ্রণালী যেন ঠিকমত থাকে বাড়তি লবণ বাদ দেবার জন্যে।

মনে রাখতে হবে উপযুক্ত চেষ্টা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ফল ভাল হবেই। ইসরাইলের মত দেশ শত শত বিঘা মরুভূমিবৎ জমিকে নানা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সুজলা সুফলা করে তুলেছে কি করে ? একাজ আমরাও করতে পারি। মরুভূমির সঙ্গে সংগ্রাম করার দুঃসাধ্য কাজ নয় শুধু অফলা জমি যা ভবিষ্যতে মরুভূমিতে পরিণত হতে যাচ্ছে তাকে আমরা তার উর্বরা শক্তি ফিরিয়ে দিতে পারি।

॥ সরকারী প্রচেষ্টা ॥

যোধপুরে সরকারী একটি সংস্থা আছে যার কাজ হল অফলা মরু-সদৃশ (desert prone) জমিগুলিকে উদ্ধার করা। এই কাজে সফল হলে আমরা মরুভূমির বিস্তার বন্ধ করতে পারি। সেটা একটা বিরাট কাজ। ভূমি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা এখানে কাজ করেন। এই সংস্থার নাম হল সংক্ষেপে DPAP অর্থাৎ মরুভূমি হতে চলেছে এমন সব জমিকে ফিরিয়ে স্বাভাবিক করা অর্থাৎ তাদের সুফলা করে তোলা। তাঁরা বলেন, "এ কাজটাও নেহাৎ ছোট নয়। সহজ ত নয়ই।" কারণ এরকম জমি ত কম নেই। তাদের আয়তন কত শুনলে অবাক হয়ে যেতে হবে।

তাঁরা বলেন, "পৃথিবীতে প্রায় ২০ কোটি হেক্টর (১ হেকটর আড়াই একর) এই রকম জমি প্রতিবছর ঐ মরুভূমির দিকে পা বাড়িয়ে চলে যাচ্ছে।" আমাদের দেশেও এরূপ জমির পরিমাণ কম হবে না।

Indian Council of Agricultural Research-এর পূর্বতন কর্মকর্তা বলেছিলেন, "পদ্ধতি আমাদের সব জানা আছে, অনেক বিশেষজ্ঞ নিয়ে কাজ করি আমরা। কিন্তু একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তুরই যা অভাব, সেটি হল অর্থ। আমরা এটা বার বার অনুভব করি, এত অর্থ কোথায়? একাজে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন সরকার তা সমগ্রভাবে দিতে একেবারেই পারেন না।"

কয়েক বছর আগে একবার ৩০০ কোটি টাকা নিয়ে ওঁরা কাজে নেমেছিলেন এবং করেক বছর ধরে কাজ চলেছিল। আপাতদৃষ্টিতে এসব কাজ নিরর্থক মনে হতে পারে। কিন্তু জমিকে বাঁচাতে না পারলে মানুষ বাঁচবে কেমন করে? এর সঙ্গে সবচেয়ে বড় কাজ অরণ্য সৃষ্টি ও সংরক্ষণ আর সেই সঙ্গে গো-চারণ ভূমির ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি বিষয়ই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

আজ আমরা দেখছি যে বন-সংরক্ষণ নীতি আইনবদ্ধ আছে।

সেই বিভাগে বহু লোক কাজ করেন কিন্তু তবু কেন বৃক্ষ শূন্য হচ্ছে এই দেশ ? তার ফলেই না আমরা ভূমিটুকুও হারাতে বসেছি।

তাই সর্বোপরি জনসাধারণকে এ বিষয়ে অবহিত করা, ভূমি ও অরণ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে শিক্ষিত করে তোলার কাজ আজ একান্ত প্রয়োজন হয়েছে। ছোট বয়েস থেকে ছেলেমেয়েরাই বা কেন জানবে না তাদের প্রিয় বাসভূমি এই পৃথিবী নামক গ্রহটির মাটিকে আর তার গাছকে ?

আরও এক শতক পরে আমরা কি দেখব যে আমরা এসে পড়েছি মরুভূমির প্রান্তে না কি মরুই এসেছে আমাদের দ্বারপ্রান্তে ?

And here were forests ancient as the hills
Enfolding sunny spots of greenery.

—Colridge





॥ বৃক্ষ ও অরণ্য সম্বন্ধে বিচিত্র তথ্য ॥

- **মাত্র একটি বৃক্ষের অরণ্য**

  একটিমাত্র বৃক্ষই অরণ্য সৃষ্টি করতে পারে। শ্রীলঙ্কায় এমন একটি বটবৃক্ষ আছে যেটিকে এক হিসাবে অরণ্য বলা যায়। গাছটিতে ৩৫০ টি গুঁড়ি এবং ৩০০০ টি ছোট গুঁড়ি রয়েছে। এই গুঁড়িগুলি তৈরি হয়েছে পাখির মলের সঙ্গে বটের বীজ গাছের ডালে বৃক্ষের চারা সৃষ্টি করেছে এবং তাদের শিকড় নেমেছে নীচে। পরে সেগুলি বৃহদাকার গাছের রূপ নিয়েছে।

- **পৃথিবীর উচ্চতম বৃক্ষ**

  (রেড-উড বৃক্ষ / আমেরিকায়) ৩৬৬·২ ফুট উচ্চ। (পুরাতন যুগের হেলে থাকা পিসার টাওয়ার মাত্র ১৭৯ ফুট)।

- **সর্বাপেক্ষা দ্রুত বর্ধনশীল বৃক্ষ**

  একপ্রকার বাঁশগাছ আছে যা ২৪ ঘন্টায় ৩৬ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়ে ওঠে।

- **সর্বাপেক্ষা বড় পত্র**

  আফ্রিকায় রাফিয়া জাতীয় তাল গাছের পাতা অতি দীর্ঘ হয় — ৪০ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে।

- **সর্বাপেক্ষা মোটা বৃক্ষমূল**

  মেক্সিকোতে মন্টেজুমা নামক একপ্রকার সাইপ্রেস গাছ এত মোটা হয় যে, মূলের ব্যাস ৪০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে।

- **সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বৃক্ষ**

  ক্যালিফোর্ণিয়া এরিজোনায় নেভাদায় এমন পাইন গাছ আছে যার বয়স ৫০০০ বছর। (মহেন-জো-দারোর প্রাচীনত্ব ৪,৫০০ বছর)

- **পৃথিবীতে কতখানি অরণ্য**

  পৃথিবীর ভূভাগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জংগলে ঢাকা।

- **রাশিয়ার অরণ্যভূমি সারাদেশের তৃতীয়াংশ**

  প্রায় গোটা অস্ট্রেলিয়ার আয়তনের সমান।